বক্সার রতন • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



কিশোর কাহিনী সিরিজ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বক্সার রতন



বক্সার রতন

বক্সার রতন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : অশোক বৈরাগী



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

ক ল কা তা ৯

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮৪ থেকে **চতুর্থ মুদ্রণ** ফেব্রুয়ারি ২০০০ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ১০৫০০
পঞ্চম মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৪ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০০০

ISBN 81-7066-834-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ
১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৫০.০০

"রা স্বা"
শ্রীমান স্বপ্ননীল চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু—



রিং-এর পাশে দুটো লোক পাশাপাশি বসে আছে। একজন বেঁটেখাটো, দুর্দান্ত স্বাস্থ্য, মুখে দাঁড়িগোফের জঙ্গল, মাথায় একটা নীল ক্যাপ, গায়ে ডোরাকাটা নীল সাদা টি শার্ট, পরনে ব্লু জীনস। অন্যজন লম্বা, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো ছিপছিপে, পরনে ধূসর রঙের স্যুট, গলায় টাই, মুখচোখ খুব ধারালো, দুজনেরই বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে।

রতন রিং-এর ভিতর থেকে দুজনকে লক্ষ করল। লক্ষ করারই কথা। গত দু-তিন মাসে সে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ও ভারতের বাইরেও নানা আসরে বক্সিং-এ নেমেছে অন্তত পাঁচ ছ'বার। দিল্লি, বাঙ্গালোর, ভুবনেশ্বর, কলম্বো এবং এখন এই খড়্গপুর। সব জায়গাতেই সে রিং-এর ধারে এই দুজনকে লক্ষ করেছে। এমন হতে পারে যে, এই মানিকজোড় বক্সিং-এর সাংঘাতিক ভক্ত। তাই যেখানে বক্সিং-এর আসর বসে সেখানেই গিয়ে হাজির হয়।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। রতন দেখেছে, এই দুজন আসে

কেবল তারই লড়াই দেখতে। আগে বা পরে যে-সব লড়াই হয়, তাতে এই দুজনের টিকিও দেখতে পাওয়া যায় না। কেন এরা তাকেই নজরে রেখেছে, তা রতন জানে না, কিন্তু আজ সে বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

গ্লাভস পরানোর আগে রতনের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছিল। পাশেই দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলা দলের ম্যানেজার চিত্তব্রত দে।

রতন মুখ তুলে ডাকল, "চিত্তদা।"

"কিছু বলছ ?"

রতন ইশারা করল। চিত্তব্রত কানটা রতনের মুখের কাছে এগিয়ে আনে।

রতন বলল, "তাকাবেন না। খুব আড়চোখে আমার ডানধারে প্রথম সারিতে দেখুন, দুজন লোক বসে আছে। একজনের মুখে দাড়ি গোঁফ, গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি, অন্যজন স্যুটেড-বুটেড। ওঁদের চেনেন ?"

চিত্তব্রত সোজা হয়ে চারদিকটা খুব উপেক্ষার চোখে একবার দেখে নেয়। তারপর মৃদুস্বরে বলে, "না। কেন বলো তো ?"

"কোথাও দেখেননি ?"

"মনে পড়ছে না।"

"আমি ওদের প্রায় সব জায়গাতেই হাজির থাকতে দেখেছি।"

ঢং করে ঘন্টা বাজল। লড়াই শুরু হতে দেরি নেই।

চিত্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, "ওদের নিয়ে ভেবো না। কনসেনট্রেট অন দি ফাইট। সুব্বা কিন্তু সাংঘাতিক অপোজিশন।"

রতন তা জানে। গত এক বছর ধরে সে আজকের রাতের জন্য তৈরি হয়েছে তিল-তিল করে। দিল্লি, বাঙ্গালোর বা কলোম্বোর চেয়ে খড়্গপুরের এই লড়াইয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। আজ রাতে হয় রতন না-হয় তো সারভিসেসের সুব্বা লাইট

হেভিওয়েট জাতীয় চ্যামপিয়ন হবে। রতনের চেয়ে সুব্বার নাম-ডাক অনেক বেশি। সুব্বা অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল, খুব অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ মেডেলটা পায়নি। তাও পয়েন্টে হেরে। সেই লড়াইতে যে জিতেছিল, সেই জাপানি বক্সারকে প্রথম দু রাউন্ডে মেরে পাটপাট করেছিল সুব্বা। সুতরাং আজকের লড়াইতে সুব্বাই হট ফেবারিট।

রতনের বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম। তার সম্বল শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দম। লড়ে সে খুবই ভাল। কিন্তু সুব্বার মতো উঁচু শ্রেণীর বক্সারের সঙ্গে তার তুলনা করবে কে ? তাছাড়া সুব্বার সঙ্গে এর আগে লড়াইয়ের কোনো সুযোগও রতন পায়নি। সুতরাং আজ তার একটু নার্ভাস লাগছিল।

রেফারী রিং-এ। রতন ও সুব্বা এসে রিং-এ ঢুকল। তুমুল হাততালি ও হর্ষধ্বনি।

সুব্বার চেহারা ভারী সুন্দর। টকটকে ফর্সা রঙ। বেশ লম্বা। শরীরের পেশীগুলি চ্যাপটা এবং আঁট। ঘাড় দারুণ মজবুত। কিন্তু বক্সারের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু চেহারায় তো বোঝা যায় না। সুব্বার দুটি হরিণচোখের পেছনে যে তীব্র অনুমানশক্তি, খর নজর এবং বুদ্ধি রয়েছে তা বাইরে থেকে টের পাওয়া দায়। তার ওপর সুব্বা অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন বক্সার। অকল্পনীয় ফুটওয়ার্ক। কেউ-কেউ তাকে আলির সঙ্গে তুলনা করে। লড়াই শুরু হওয়ার ঘন্টা পড়তেই রেফারি দুজনকে রিং-এর মাঝখানে ডাকলেন। মৃদুস্বরে পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিলেন সংক্ষেপে। দুজনে গ্লাভ্‌সবদ্ধ হাতে হাত ঠেকাল।

তারপরই যে যার নিজের কোণে সরে গেল।

লড়বার মুহূর্তে আবার একবার রতনের চোখ পড়ল রিং-এর পাশে বসা সেই দুটি লোকের দিকে। তারা রতনের দিকে

একবারও তাকাচ্ছিল না। রিং-এর ওপরে ঝুলন্ত আলোর দিকে খুব আনমনে চেয়ে ছিল। কিন্তু রতনের মনে হয়, ওরা তাকে খুব ভাল করেই লক্ষ করছে।

জিতবে কি হারবে তা রতন জানে না। তবে ঘুষি খেতে খেতে আর ঘুষি মারতে মারতে তার একধরনের নির্বিকার ভাব এসে গেছে। ভয়ডরের ব্যাপার নয়। অভ্যাস। কেবল আজকের লড়াইটা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত লড়াই বলে এবং প্রতিপক্ষ সুব্বার মতো সাংঘাতিক বক্সার বলে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল রতন। আজকে আর যে পাঁচটি লড়াই হয়ে গেছে তার মধ্যে মাত্র একটিতে ব্যানটাম ওয়েটে পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রতিযোগী ছিল, মদন রায়। পাঞ্জাবের বীর সিং-এর কাছে সে পয়েন্টে হেরে গেছে। রতন আর মদন ছাড়া আর কোনো বাঙালি বক্সার এবার ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি। মদন হেরে গেছে, রতনও হারবে বলেই সবাই ধরে নিয়েছে। আর সেইটিই রতনের সবচেয়ে সুবিধে, সে হারলেও লজ্জা নেই। কেউ দুয়ো দেবে না। বরং যদি ভাল লড়ে হেরেও যায়, তবু সবাই প্রশংসা করবে।

কিন্তু ভাল লড়াইয়ের জন্য প্রচণ্ড মনঃসংযোগ দরকার। বক্সিং-এ এক চুল ভুল, এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশের সময়ের হিসেবে গোলমাল একটুখানি চকিত সুযোগের অপব্যবহারও সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। মন, চোখ, হাত, পা, মগজ সব তুখোড় সজাগ আর সচল রাখা চাই। বিশেষত সুব্বার মতো প্রতিপক্ষ যেখানে।

কিন্তু রতনের মনোযোগ আজ দুলছে। যে দুটো লোক রিং-এর পাশে চুপ করে বসে আছে, তাদের নিয়ে তার তেমন মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তবু সে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ

করছে।

আর মিনিটখানেকের মধ্যেই লড়াই শুরু হবে। সুব্বা দু হাত তুলে দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিচ্ছে। কালো স্পোর্টস প্যান্ট, কালো আর সাদা স্যান্ডো গেঞ্জিতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে সুব্বাকে। রতনের নিজের চেহারাও তেমন কিছু খারাপ নয়। তবে সুব্বার মতো ফর্সা নয় তার রং। অত টানা-টানা চোখও তার নেই। কিন্তু মেদহীন রুক্ষ শরীরে তার একটা ঝড়ো ভাব আছে। লড়াইয়ের সময় সে জেতার জন্য জান লড়িয়ে দিতে জানে। এইসব কারণে এই অল্প বয়সেই বক্সার হিসেবে তার কিছু নাম-ডাক হয়েছে। সেমি ফাইনালে সারভিসেসের একজন ঝানু বক্সারকে সে পয়লা রাউণ্ডেই নক আউট করেছিল।

চিত্তব্রত সামান্য ম্লান হেসে বলল, "শোনো, প্রতিপক্ষ যত নামজাদাই হোক, দুনিয়ায় অপরাজেয় কেউ নেই।"

হঠাৎ রতন বলল, "চিত্তদা, ওই দুটো লোককে আপনি একটু নজরে রাখবেন। ওরা কেন সব জায়গায় আমার লড়াই দেখতে আসে তা জানা দরকার।"

চিত্তব্রত অবাক হয়ে বলল, "এক্ষুনি লড়াই শুরু হবে, আর তুমি এখন কে না কে দুটো লোকের কথা ভাবছ? আজে-বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এখন কনসেনট্রেট করো তো! নইলে পয়লা রাউণ্ডেই ঘায়েল হয়ে যাবে। সুব্বা ইজ ট্রিকি, ভেরি ট্রিকি।"

শেষ ঘন্টা বাজল। রতন কাঁধ থেকে তোয়ালেটা ফেলে উঠে দাঁড়াল।

রেফারী মাঝখান থেকে সরে গেলেন। তারপরই চেঁচিয়ে বললেন, "ফাইট!"

রতনের চোখে আলোটা একটু ঝলসে উঠল কি? নাকি রেফারীর স্বর তার কানে একটু দেরিতে পৌঁছল? কিছু একটা

গোলমাল হয়ে থাকবে। কারণ, রেফারীর চিৎকার শেষ হতে না হতেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো, সাপের ছোবলের মতো, চাবুকের মতো তিনটে ঘুষি উপর্যুপরি নাড়িয়ে দিয়ে গেল তার চোয়াল, কপাল আর ডানদিকের কান।

মেঝের ওপর থেকে নিজের শোয়ানো শরীরটা যখন টেনে তুলছিল রতন, তখন তার কপালের কাটা জায়গাটা দিয়ে গরম রক্ত স্রোতের মতো নেমে এসে মুখ আর বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। ডান কানে একটি ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। ডান চোখ রক্তে বুঁজে এসেছে। চোয়াল একদম লক জ' হয়ে আটকে রয়েছে। হয়তো হাঁ করতে পারবে না, চেষ্টা করলেও।

রেফারী ছয় পর্যন্ত গুনে শেষ করেছেন। রতন তখন উঠে দাঁড়াল।

দর্শকরা সবাই চিৎকার করে আর হাততালি দিয়ে সুব্বাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

রেফারী মৃদুস্বরে রতনকে জিজ্ঞেস করলেন, "উড ইউ ফাইট অর রিটায়ার?"

রতন মাথা নাড়ল, গ্লাভস দিয়ে ডান চোখের রক্ত খানিকটা মুছে নিয়ে আড়ষ্ট চোয়ালে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল, "ফাইট! ফাইট!"

"ফাইট!" বলে চেঁচিয়ে রেফারী সরে গেলেন।

ঘুষি খাওয়া বা রক্তপাত রতনের কাছে নতুন নয়। সে হতভম্ব হয়ে গেছে সুব্বার চকিত আক্রমণে। এত দ্রুত যে কারো হাত-পা চলতে পারে তা রতনের জানা ছিল না। সে বুঝল, সে যা শুনেছিল, সুব্বা তার চেয়েও ভাল লড়িয়ে।

রতনের দ্বিধা আর অমনোযোগের যে ভাবটা ছিল, তা তিনটি ঘুষিতেই একদম কেটে গেল। যে দুটো লোককে দেখে সে

অস্বস্তি বোধ করছিল, তাদের কথা আর তার মনেই রইল না। তার সামনে শুধু জেগে রইল রিং-এর ছোট্ট চৌহদ্দি আর তার মধ্যে দুর্ধর্ষ এক প্রতিপক্ষ।

নিয়ম হচ্ছে প্রতিপক্ষকে একবার ভাল করে মার জমাতে পারলে তারপর তাকে যথেচ্ছ মারা। তাকে আর থিতু হতে না দেওয়া, কেবল তাড়া করে যাওয়া। ফলে তার মনোবল ভেঙে যায়। সে হারে।

সুব্বাও তাই করতে চাইছিল। হয়তো ভেবেছিল সে প্রথম রাউণ্ডেই এই এলেবেলে লড়াইটা শেষ করে ড্রেসিং রুমে একটু জিরিয়ে নেবে।

কিন্তু মার খাওয়া রক্তাক্ত রতন চমৎকার পায়ের কাজে বাঁ দিকে সরে গিয়ে এবং ঠিক সময়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে সুব্বার দু দুটো করাল ডানহাতি রাউণ্ডহাউস এড়িয়ে গেল।

সুব্বা ডান হাতে মারছে ! তার মানে সুব্বার গার্ড নেই। অর্থাৎ জয় সম্পর্কে সে এতই নিশ্চিত যে, রতনের সম্ভাব্য প্রতি-আক্রমণের কথা সে মনেই ঠাঁই দেয়নি।

রতনের পিছিয়ে যাওয়া দেখে সুব্বা খুব সহজভাবেই এগিয়ে এসে দু হাতে কয়েকটা চকিত ওয়ান-টু চালাল তার মুখে। কোনোটাই লাগল না। রতন গ্লাভসে আটকে দিল।

রতন দড়ির ওপর ভর দিয়ে সুব্বার মার আটকাচ্ছিল যখন, সেই সময়ে পিছন থেকে কে যেন চাপা গলায় বলল, "লেফট ! লেফট ! হি হ্যাজ নো গার্ড।"

দৈববাণীর মতো সেই কণ্ঠস্বর কি চিত্তদার ? কে জানে। কিন্তু রতন চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল, সুব্বার বাঁ দিকটা অরক্ষিত।

কিন্তু দড়ির ভর ছেড়ে উঠে মারতে যে সময় লাগবে ততটা

সময় সুব্বা দেবে কি ? মহম্মদ আলি জর্জ ফোরম্যানের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় রিং-এর দড়িকে খুব কাজে লাগিয়েছিল। ঝুল খেয়ে, সরে গিয়ে, দড়িটাকে স্প্রিং-এর মতো ব্যবহার করে আলি জিতেছিল সেই লড়াই। আর সেই কৌশলের নাম আলি নিজেই দিয়েছিল 'রোপ এ ডোপ'।

রতন দড়ির সেই খেলা জানে না। আলির পক্ষে যা সম্ভব, তা কি যে-কেউ পারে ? কিন্তু মজা হল রিং-এর দড়িটা তার পিছন দিকে স্প্রিং-এর মতো কাজ করছে। দড়িতে একটা ঝুল খেয়ে দেখবে নাকি ?

সুব্বার আর-একটা জ্যাব বুকের ডান ধারে লাগতেই দম বন্ধ করে রতন পিছন দিকে প্রচণ্ড গতিতে একটা ধাক্কা দিল। দড়িটা স্প্রিং-এর মতোই তাকে উল্টে ছুঁড়ে দিল ভিতর দিকে। রতন ছিটকে সরে এল ভিতরে।

সুব্বা ঘুরে দাঁড়াতেই রতন তার প্রথম ঘুষিটা জমাতে পারল। বেশ জোরালো এবং মোক্ষম মার। সুব্বার কপালের ঠিক মাঝখানটায়।

সুব্বা একটু পিছিয়ে গেল মাত্র। আর কিছু নয়।

রতন স্পষ্ট শুনল, তার ডান-পাশ থেকে কে যেন বিরক্তির গলায় বলছে, "লেফট ! ইউজ ইয়োর লেফট !"

'হুশ' করে একটা প্রচণ্ড শ্বাস ছাড়ল রতন। সুব্বা আর একতরফা মারছে না। সরে গেছে। ঘুরছে নেচে-নেচে।

হঠাৎ রতন দেখতে পেল, সুব্বার কপালের মাঝখানটা কেটে গেছে। সামান্য একটা রক্তের রেখা নেমে এসেছে সাদা কপাল বেয়ে নাকের ওপর। তার ঘুষিটা বৃথা যায়নি।

আড়ষ্ট ঠোঁটে আপনমনেই একটু হাসল রতন। দুনিয়ায় অপরাজেয় কেউ নেই।



প্রথম রাউন্ড শেষ হতে বাকি ছিল না বেশি। ঘন্টা পড়ো-পড়ো প্রায়। ঠিক সেই সময়ে সুব্বা তার ওস্তাদের মারটি মারল।

অভিনয়টা ছিল চমৎকার। দুটো ভুয়ো ঘুষি চালিয়ে কয়েকটা পয়েন্ট সংগ্রহ করে পিছিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই সে শরীরে একটা মোচড় দিয়ে দুম করে একটা আপার কাট চালিয়ে দিল।

ঘুষিটা লাগলে রতনকে উঠতে হত না আজ। কিন্তু লাগার আগেই আবার সেই দৈববাণী, "হি ইজ ফেইনিং। গেট আউট অফ হিজ রীচ।"

অর্থাৎ, ও অভিনয় করছে, ওর নাগাল থেকে সরে যাও।

রতন সরল ঠিকই, তবে একটু খেলিয়ে। সুব্বাকে সে ঘুষিটা তৈরি করতে দেখল। ঘুষিটা আসছে, তাও দেখল। তারপরই টুক করে মাথাটা নামিয়ে ঘুষিটাকে বইয়ে দিল মাথার ওপর দিয়ে। আর তক্ষুনি দেখতে পেল তার ডান হাতের সোজাসুজি সুব্বার থুতনি। অরক্ষিত এবং অসহায়।

এই সুযোগটাকে কাজে না লাগায় কোন্ বোকা? স্বয়ংক্রিয় ভাবেই রতনের ডানহাত পিস্টনের মতো পিছনে সরে এসেই হাতুড়ির মতো গিয়ে পড়ল সুব্বার চোয়ালে।

এত জোরালো ঘুষি রতন জীবনে কাউকে মারেনি। তার কব্জি ঝন্‌ঝন্ করে উঠল আঘাতের প্রতিক্রিয়ায়।

কিন্তু সুব্বা বক্সার বটে। ঘুষিটা খেয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পড়ে গেল না। মুখে বিস্ময়, চোখে অবিশ্বাস। দুই গ্লাভসবদ্ধ হাত দুদিকে ঝুলছে। ভ্রূ কুঁচকে সে সামনের দিকে চেয়ে যেন খুব কষ্টে কিছু দেখবার চেষ্টা করল।

রতনও হাঁ করে চেয়ে ছিল। ঐ ঘুষি খেয়েও যদি সুব্বার কিছু না হয়, তবে ধরে নিতে হবে সুব্বাকে হারানো অসম্ভব। হা

ঈশ্বর।

কিন্তু সুব্বা দাঁড়ানো অবস্থায় রইল কয়েক সেকেন্ড। চোখের দৃষ্টি চকচকে হয়ে শূন্য হয়ে গেল হঠাৎ। হাঁটু ভাঁজ হয়ে শরীর ধীরে-ধীরে ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর।

কে যেন দানবীয় স্বরে পিছন থেকে প্রম্পট করছিল, "হিট হিম। হিট হিম এগেন।"

কিন্তু ঐ মহান বক্সারকে ওরকম অসহায় অবস্থায় আর একটি ঘুষিও মারতে বাধল রতনের। সুব্বা তার ঘুষি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, এটাই তো তার জীবনের এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

রেফারী গুনতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু রাউন্ড শেষ হওয়ার ঘন্টা পড়ায় সুব্বা নক আউট হল না। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসানো হল টুলে।

রতনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চিত্তব্রত বলল, "ভাবা যায় না কী তুমি করেছ। ওফ্।"

অ্যান্টিসেপটিকে-ভেজানো তুলোয় ক্ষতস্থান জ্বালা করে উঠল রতনের। তবু সে একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। পৃথিবীতে কেউই অপরাজেয় নয়। তবে সুব্বা এখনো হারেনি। পরের রাউন্ডে আছে। তার পরের রাউন্ড আছে। সে চোখ বুজে রইল। হঠাৎ একটু চমকে উঠল সে। চিত্তব্রতর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "চিত্তদা, আপনি আমাকে ডিরেকশন দিচ্ছিলেন?"

চিত্তব্রত অবাক হয়ে বলে, "না তো!"

রতন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে ডানদিকে তাকাল। না, রিং-এর ধারে বসা সেই দুই মূর্তি নেই। দুটি চেয়ার ফাঁকা পড়ে আছে।

দর্শকদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুব্বাকে ঘিরে অনেক লোক। ক্লান্তিতে চোখ বুজল রতন।

দ্বিতীয় রাউন্ডের ঘন্টা পড়তেই রতন টুল ছেড়ে উঠল। কিন্তু

সুব্বা উঠল না। তাকে তখনো দুজন লোক পরিচর্যা করছে। সুব্বার চোখ বোজা, ঘাড় হেলানো।

রতন যখন অপেক্ষা করছে, তখন সারভিসেসের ম্যানেজার রেফারীর কাছে এসে মৃদুস্বরে কী একটু বলে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বিস্ময়-ভরা চোখে রতনকে দেখে গেলেন।

রেফারী যখন এগিয়ে এসে রতনের একখানা হাত ঊর্ধ্বে তুলে তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন, তখনো রতন বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কী হল, দর্শকরা কিন্তু তখন পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে আনন্দে, কয়েকজন রিং-এর মধ্যে ঢুকে রতনকে কাঁধে নিয়ে একপাক ঘুরলও।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে রতনের মাথায় ঢুকল যে, সে প্রথম রাউন্ডেই টেকনিক্যাল নট-আউটে সুব্বাকে হারিয়ে লাইট হেভিওয়েটে এবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

চিত্তদা এসে একটা তোয়ালে জড়িয়ে রতনকে টেনে নিয়ে গেলেন ড্রেসিং রুমে। বাংলার অন্যান্য মুষ্টিযোদ্ধারা রতনকে আদরে-আদরে অস্থির করে তুলল। সারভিসেসের ম্যানেজার স্বয়ং এসে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন দি সারভিসেস, জাস্ট সে ইট।

খবর এল, সুব্বার চোয়ালের হাড় ভেঙেছে, সে এখন হাসপাতালে। বক্সিং জিনিসটা এরকমই। প্রতিপক্ষকে কখনো অবহেলা করতে নেই। প্রতিপক্ষকে অবহেলা করে জো লুই তাঁর সবচেয়ে খ্যাতির সময়ে জার্মানির স্মেলিং-এর কাছে হেরে যান। প্যাটারসন হেরে গিয়েছিলেন সুইডেনের অখ্যাতনামা জোহানসনের কাছে। এমন কী, মহম্মদ আলিকেও স্পিংকসের মতো নাবালক মুষ্টিযোদ্ধার কাছে মাথা নোয়াতে হল এই তো সেদিন।

এত অল্প বয়সে অপ্রত্যাশিত এত বড় একটা লড়াই জিতেও রতনের তেমন আনন্দ হয় না। আসলে আনন্দ পাওয়ার মতো মনটাই তার হারিয়ে গেছে। কারণ তার এই জয়ে খুশি হওয়ার মতো আপনজন কেউ তো নেই। তার মা মারা গেছেন, বাবা পাগল, এক দিদি বিয়ের পর কর্ণাটকের এক শহরে থাকে, দেখাই হয় না তার সঙ্গে। তাছাড়া রতনরা খুবই গরিব। বক্সিং করে বলে রতন একটা সামান্য চাকরি পেয়েছে। সেই টাকায় খুব কষ্টেই চলে তাদের।

অথচ কষ্টের কারণ ছিল না। তার বাবা ছিলেন একজন নাম-করা বৈজ্ঞানিক। কী একটা বস্তু আবিষ্কার করার ভূত চেপেছিল তাঁর মাথায়। তাই নিয়ে দিনরাত ভাবতে ভাবতে একদিন পাগলামি দেখা দিল। অবশ্য অনেকে বলে তাঁর একজন সহকারী ছিল। সেই নাকি ওঁর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল ওষুধ খাইয়ে। এখনো নিজের ল্যাবরেটরিতেই দিনরাত তিনি কাজ করেন। তবে সে-কাজ পাগলামিরই নানারকম খেয়াল খুশি। রতনের এক বুড়ি পিসি তাঁর দেখাশোনা করেন। আর কেউ নেই।

রাত্রিবেলা সবাই ঘুমোলে পর রতন আজ একা বাইরে এসে দাঁড়াল। প্রচণ্ড শীত। সে একবার আকাশের দিকে তাকাল। বুকটা হু-হু করে উঠল হঠাৎ। চোখে এল জল। এই পৃথিবীতে তার মতো হতভাগা আর কে আছে, যার জীবনে একটা আনন্দের ঘটনা ঘটলেও সে-আনন্দের ভাগিদার কেউ নেই?

নির্জন আলো-আঁধারে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রতন একটু দূরের স্টেডিয়ামটা দেখতে পাচ্ছিল। দেখতে দেখতে লড়াইয়ের দৃশ্য ভেসে উঠছিল চোখে। হঠাৎ তখন সেই দুটো লোকের কথাও মনে পড়ল তার।

ওরা কী চায় ? তাকে অনুসরণই বা করছে কেন ? ওরা ভাল লোক, না মন্দ লোক ? লড়াইয়ের সময় ওরাই কি নানারকম পরামর্শ দিচ্ছিল তাকে ?

এইসব ভাবতে-ভাবতে আনমনে রতন চোখ ফেরাতেই তার শরীরটা শক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। বক্সারের মজবুত হৃৎপিণ্ডও যেন একটু ধুকপুক করে উঠল। তার ডানদিকে একটু দূরে মাঠের ওপর সেই দুই মূর্তি পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।



ধীর পায়ে দুজন এগিয়ে এল। লম্বা লোকটি ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ইংরিজিতে বলল, "কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স। তুমি খুব ভাল বক্সার।"

রতন অবাক হয়েছিল ঠিকই। তবে নিজেকে সামলে নিয়ে লোকটার সঙ্গে করমর্দন করে ইংরিজিতে বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু তোমরা কারা ? বিদেশী ?"

লম্বা লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক ধরেছ। আমরা বিদেশী। আমার নাম জন, আর আমার এই বন্ধুর নাম রোলো।"

ভদ্রতাবশে রতন রোলোর দিকেও হাত বাড়াচ্ছিল। কিন্তু জন টপ করে তার হাতটা ধরে ফেলে বলল, "ও-কাজ কোরো না। রোলোর কোনো সৌজন্যবোধ নেই।"

রতন ভাল করে তাকিয়ে দেখল, রোলোর মুখে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর নির্দয়তার চিহ্ন আছে। চোখ দুটো আধবোজা এবং

পলকহীন। মুখে কেমন একটা বোকা-বোকা ভ্যাবলা ভাব। রোলোর দিকে তাকালে খুব সাহসী লোকেরও অজ্ঞাত কারণে একটু গা ছমছম করবে।

জন বলল, "তোমাকে এত রাতে বিরক্ত করতে এসেছি বলে কিছু মনে কোরো না। তোমার সঙ্গে আমাদের একটু গোপনে দেখা করা দরকার ছিল। আমরা বিদেশী, তাই সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। গভীর রাত ছাড়া উপায় ছিল না।"

রতন একটু হেসে বলল, "কিন্তু এখন তো আমার ঘুমিয়ে থাকার কথা। আজ ঘুম আসেনি বলে আমি বাইরে এসেছিলাম। না এলে তোমরা কী করতে!"

জনও হাসল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, "তুমি বাইরে না এলে আমরা তোমার ঘরে যেতাম। আমাদের দরকারটা জরুরি।"

রতন আগাগোড়া একটা অস্বস্তি বোধ করছে। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে, এরা খুব সহজ সাধারণ লোক নয়। বক্সিং করতে গিয়ে রতনকে সাহেব-সুবোর সঙ্গে অনেক মিশতে হয়েছে। এরা দুজন তাদের মতো নয়। এদের চারদিকে একটা রহস্যের ঘেরাটোপ রয়েছে।

রতন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি, তোমরা বক্সিং দেখে বেড়াচ্ছ নানা জায়গায়। তোমরা কি বক্সিং ভালবাসো?"

"নিশ্চয়ই। আমরা সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছি ভাল প্রতিভাবান ন্যাচারাল বক্সার খুঁজে বের করতে। তোমার মধ্যে আমরা সেইরকম একজনকে খুঁজে পেয়েছি।"

রতন একটু অবাক হয়ে বলল, "আর সেই জন্যই এত রাতে আমার কাছে এসেছ?"

জন মৃদু হেসে বলল, "অনেকটা তাই। আমরা তোমাকে



আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে প্রফেশন্যাল বক্সিং-এ নামাতে চাই।”

আমেরিকায় যাওয়ার কথায় রতন খুশি হয় ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে আর একটা কারণে তার মন খারাপ হয়ে যায়। সে বলে, “কিন্তু আমার বাবাকে ফেলে আমেরিকায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বাবা পাগল। তাঁকে খাওয়াবে পরাবে কে?”

জন একটু চুপ করে থেকে বলে, “শুনে দুঃখ পেলাম। তবে তুমি যদি চাও তো তোমার বাবাকেও আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার



ব্যবস্থা করতে পারি। সেখানে মানসিক রুগিদের ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তোমার বাবা হয়তো সুস্থ্ স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন এবং তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণা আবার শুরু করতে পারবেন।”

বিজ্ঞান-গবেষণা ! শুনে চমকে উঠল রতন। বলল, “আমার বাবা যে বিজ্ঞানের গবেষণা করতেন, সে-কথা তোমরা জানলে কী করে ?”

“তোমার সম্পর্কে আমরা সবরকম খোঁজ-খবর নিয়েছি।”

রতন বলল, "আমেরিকায় যাওয়ার অনেক খরচ। সে-টাকা কে দেবে ?"

"আমি দেব। আমেরিকায় আমি হব তোমার ম্যানেজার। তুমি যখন বক্সিং থেকে অনেক টাকা রোজগার করবে, তখন এই টাকা শোধ হয়ে যাবে। ওটা নিয়ে ভেবো না।"

"তুমি কি আমেরিকান ?"

জন ম্লান হেসে মাথা নাড়ল, "না। আমি আমেরিকান নই। আমি পৃথিবীর সব ধনী দেশের শত্রু।"

"তার মানে ?"

"মানেটা আস্তে-আস্তে বুঝতে পারবে। তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শত্রুতা করতে হলে তেমনি শক্তিশালী অস্ত্র চাই। শুধু বক্সিং দিয়ে তো ওদের ঘায়েল করা যাবে না।" বলে জন একটু হাসল। তারপর বলল, "কথাগুলো তোমার কাছে ধাঁধার মতো লাগছে, না ?"

রতন মাথা নেড়ে বলল, "হয়তো আমি ইংরিজি ভাল জানি না বলেই তোমার সব কথা বুঝতে পারছি না।"

জন মাথা নেড়ে বলল, "ইংরিজির দোষ নেই। তুমি তো খুব সুন্দর ইংরিজি বলো। বোধহয় ভালো কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছ, তাই না ?"

রতন মাথা নিচু করে বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমাদের ইংরিজি ভাষার প্রতি একটা হ্যাংলামি আছে। তা হোক, ইংরিজি ভাষা তোমার বিস্তারে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে যদি ইংরেজদের গুণগুলো পেতে তাহলে আরো ভাল হত।"

রতন লজ্জায় একটু রাঙা হল। বলল, "তোমার কি আর কোনো কথা আছে ?"

জন গম্ভীর গলায় বলল, "আছে, তোমার বাবা যখন পাগল

হয়ে যান তখন তিনি কোন্ বিষয়ে গবেষণা করছিলেন তা কি তুমি জানো ?"

"না। বাবার যখন মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল তখন আমি খুব ছোট।"

জন গলাটা একটু খাটো করে বলল, "সেই সময়ে তোমার বাবার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। তাকে তোমার মনে আছে ?"

রতন বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল, "বাবার সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ ছিল না। আমি দিল্লির একটা ভাল স্কুলে পড়তাম, থাকতাম বোর্ডিং-এ। তবে শুনেছি বাবার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, তার নাম বোধহয় ছিল রাব্বি।"

জন একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, "হ্যাঁ। রবিন ফরডাইক ; ওদের পরিবার ছিল জার্মান ইহুদি।"

"আমি অত জানি না। রাব্বিকে আমি দেখিনি।"

জন মৃদুস্বরে বলে, "তোমার বাবা যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন রবিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। রবিন বা রাব্বি খাঁটি ইহুদি নয়। তার মা ছিল ব্যাংককের মেয়ে। রবিন যেমন মেধাবী তেমনি ধূর্ত। সে ভেবেছিল তোমার বাবাকে ভাঙিয়ে সারা দুনিয়া জুড়ে একটা একচেটিয়া ব্যবসা করবে।"

রতন হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "আমি তো এতসব জানি না। শুধু শুনতে পাই আমার বাবাকে তাঁর এক অ্যাসিস্ট্যান্ট নাকি কী একটা ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছিল।"

জন বলল, "হতে পারে। তবে যে-উদ্দেশ্যে রবিন তোমার বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিল তা সফল হয়নি। তুমি বিজ্ঞানের কিছু জানো ?"

"খুব সামান্য। বাবা পাগল হয়ে যাওয়ায় আমি বেশিদূর

পড়াশুনো করতে পারি নি। সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করি।”

“তবু এটা তো জানো যে, সারা দুনিয়ায় এখন একটা এনার্জি ক্রাইসিস চলছে!”

“কিছুটা জানি। মাটির নীচে খনিগুলির কয়লা ফুরিয়ে আসছে, শেষ হয়ে আসছে পেট্রোলিয়ম, পারমাণবিক শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়।”

“বাঃ, তবে তো অনেকটাই জানো। আর এই শক্তি বা তাপের যে দুর্ভিক্ষ দুনিয়ায় শিগগিরই দেখা দেবে তার জন্য বিশ্বের সব ছোট-বড় রাষ্ট্রই যে সমুদ্র বা সূর্যরশ্মি থেকে বিকল্প শক্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে, তাও তো জানো!”

“জানি। তবে সে-কাজে মানুষ এখনো সম্পূর্ণ সফল হয়নি।”

“ঠিক। তোমার বাবা যে গবেষণাটা করছিলেন, তাও এই এনার্জি নিয়েই। তিনি অবশ্য কোনো বিকল্প শক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন না। তবে তিনি সফল হলে দুনিয়া থেকে চিরকালের মতো এনার্জি ক্রাইসিস বিদায় নিত।”

“সেটা কী জিনিস?”

“তাঁর কাজটার নাম ছিল হিট অ্যামপ্লিফিকেশন। নামটা অবশ্য খুব সুন্দর নয়, কিন্তু কাজটা ছিল দারুণ গুরুতর।”

“কী রকম?”

“শব্দকে যেমন অ্যামপ্লিফায়ারে বহুগুণ বাড়ানো যায়, তেমনি তাপকেও হয়তো বাড়ানো সম্ভব। তাপ বিবর্ধন নিয়েও সারা দুনিয়ায় গবেষণা চলছে। কিন্তু আমরা খবর রাখি, তার মধ্যে তোমার বাবাই লক্ষের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেইসময়ে একটা গুরুতর কিছু ঘটে যায় এবং তিনি পাগল হয়ে যান। রবিনও তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।”

লোকটা ভাল না খারাপ তা বুঝতে পারছে না রতন। ওর মতলবটা কী তাও সে এখনো সঠিক জানে না। তবে তার বাবার আবিষ্কার সম্পর্কে যে এ-লোকটা খবর রাখে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রতন বলল, "অতীত নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে? যা চুকে-বুকে গেছে তা আবার খুঁচিয়ে তুলতে আমার খারাপ লাগে।"

জন একটু হাসল। তারপর বলল, "ভারতীয়রা সব ব্যাপারেই একটু উদাসীন আর নির্লিপ্ত থাকতে ভালবাসে। আর তার জন্যই ভারতের উন্নতি ঘটেনি, ঘটবেও না। কিন্তু আমরা যারা বেঁচে থাকতে ভালবাসি এবং দুনিয়াকে দখল করার স্বপ্ন দেখি, তারা সহজে কিছু ছেড়ে দিতে রাজি নই। তোমার বাবা কেন পাগল হলেন বা তাঁর আবিষ্কারের মূল্য কতটা তা জানার আগ্রহ তোমার থাকা উচিত। তিনি যদি সত্যিই হিট অ্যামপ্লিফায়ার আবিষ্কার করে থাকেন তবে তার দাম এখনকার দুনিয়ায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। তুমি মহম্মদ আলির মতো বড় বক্সার হলেও কোনোদিন তত ডলার রোজগার করতে পারবে না।"

রতন কী বলবে? চুপ করে রইল।

জন তার কাঁধে একখানা হাত রেখে বলল, "কাল তুমি তোমার দলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাও। আমরা দু চারদিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

এই বলে জন আর রোলো চলে গেল।

তাদের হঠাৎ আসা আর হঠাৎ চলে যাওয়াটা এমনই অস্বাভাবিক যে, ঘটনাটা স্বপ্ন না সত্য, তা নিয়ে রতনের একটু ধাঁধা রয়ে গেল।



বাঞ্ছারাম তাঁর দিদি হৈমবতীকে বললেন, "দিদি, আকাশে যখন রসগোল্লাটা ওঠে, তখনই আমার ঠিক খিদে পায়।"

বাঞ্ছারাম যা বলেন, তাঁর দিদি হৈমবতী তাতেই সায় দিয়ে যান। কারণ, তিনি কানে শোনেন না। বাঞ্ছারামের আবোল-তাবোল কথা তাঁর কানে এক বর্ণও ঢোকে না। এ কথাটা শুনেও হৈমবতী বললেন, "তা তো ঠিকই।"

ল্যাবরেটরির বারান্দায় বাঞ্ছারাম একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। পাশে একটা মোড়ায় বসে হৈমবতী। হৈমবতীর বয়স আশির কোঠায়। বাঞ্ছারামের চেয়ে বাইশ বছরের বড়। এই দিদিই বাঞ্ছারামকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন। নিঃসন্তান এই দিদির কাছে বাঞ্ছারাম সন্তানের মতোই। বরাবরই তাঁর যত আব্দার সব এই দিদির কাছে।

সন্ধের পর আকাশে বড়-সড় পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। বাঞ্ছারাম চাঁদের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "ইশ, কী বিরাট রসগোল্লা! কারা যে বানায়! রসে একেবারে টৈ-টুম্বুর।" বলে মুগ্ধ হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন চাঁদের দিকে। তারপর বাচ্চা ছেলের মতো আদুরে গলায় বললেন, "ও দিদি, আমি রসগোল্লা খাব। খিদে পেয়েছে।"

হৈমবতী মাথা নেড়ে বললেন, "যা বলেছিস। ছেলেটা নিশ্চয়ই খড়্গপুর থেকে মাসির বাড়ি গেছে। আজ পর্যন্ত একটা চিঠি নেই।"

বাঞ্ছারাম বিরক্ত হয়ে দিদির দিকে তাকালেন। তারপর "হুঁঃ! যতো সব।" বলে উঠে গিয়ে নিজের গবেষণাগারে ঢুকে আলো জ্বাললেন।

গবেষণাগারের অবস্থা অবশ্য শোচনীয়। চারদিকে মাকড়সার জাল, ঝুল, নোংরা। যন্ত্রপাতিও বেশির ভাগই পুরনো আর অকেজো। তবু নেই-নেই করেও ল্যাবরেটরিতে শিশি বোতল বুনসেন বার্নার, নানারকম ধাতব পাত্র, রাসায়নিক, ছোটখাটো বিচিত্রদর্শন কলকব্জা বড় কম নয়। বাঞ্ছারাম দরজাটা বন্ধ করে গম্ভীরভাবে একটা চেয়ারে বসলেন। চেয়ারটা কিছু অদ্ভুত। দেখতে সাধারণ চেয়ার হলেও তার পায়ার বদলে চারটে চাকা লাগানো। চেয়ারের তলায় একটা পিপের মতো বস্তু রয়েছে। বাঞ্ছারাম চেয়ারে বসে একটা হাতল টানতেই একটা কলকল শব্দ হল, পিপেটা ঘুরতে লাগল আর চেয়ারটাও আস্তে-আস্তে চলতে লাগল। এটা হচ্ছে বাঞ্ছারামের আবিষ্কার, জ্বালানিহীন সুলভ জলচালিত যান। পিপের মধ্যে নানা খোপে জল ভরে রাখা আছে। হাতল টানার সঙ্গে সঙ্গেই সেই খোপগুলির মধ্যে কয়েকটা উল্টে যায়। জল গিয়ে অন্য পাত্রে পড়ে। আবার সেই পাত্রগুলো উল্টে যায়। এরকম ভাবে পিপের মধ্যে জলে একটা গতি সঞ্চারিত হয়। পিপেটা ঘুরতে থাকে আর সেই ঘূর্ণনে চেয়ারটাও চালিত হয়।

চেয়ার চালিয়ে বাঞ্ছারাম ল্যাবরেটরির ভিতরে কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়ালেন। একটা টেবিলের কাছে থেমে চেয়ে রইলেন ভুরু কুঁচকে। টেবিলে একটা বিল্ট-ইন-বেসিন। বেসিনের কলের সঙ্গে লাগানো ছোটো একটা জলবিদ্যুৎ যন্ত্র। বহুকাল আগে, বড় কাজে যখন তেমন হাত দেননি বাঞ্ছারাম, তখন এইসব মজার জিনিস তৈরি করতেন। জলের ট্যাপ খুললেই

জেনারেটর চালু হবে। তাই দিয়ে একটা গোটা ঘরের আলো-পাখার ব্যবস্থা। এক পয়সা খরচ নেই।

তবু এগুলোর পেটেন্ট নেননি বাঞ্ছারাম। তাঁর মাথায় হিট অ্যামপ্লিফিকেশনের যে স্বপ্ন ছিল, তা কাজে করতে পারলে জগৎজোড়া খ্যাতি হবে। পৃথিবীর অশেষ মঙ্গল ঘটবে। তাই ছোটোখাটো আবিষ্কারগুলোকে তিনি বিশেষ মূল্য দেননি। আজও দেন না।

চেয়ার চালিয়ে তিনি জানলার ধারে এলেন। সেখানে একটা টেবিলের ওপর কাঁচের একটি গোলক। গোলকটির দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অর্ধেক আকাশের ছায়া পড়েছে গোলকে। গ্রহ-নক্ষত্রের নিখুঁত ছবি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

ঘুরতে-ঘুরতে বাঞ্ছারাম এলেন ল্যাবরেটরির মাঝখানে মস্ত টেবিলটার ধারে। টেবিলের ওপর আজও রয়েছে কলসির মতো দেখতে বড়-সড় একটা ধাতব পাত্র। তলায় একটা ফুটো। এই যন্ত্রটাই ছিল বাঞ্ছারামের জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। সবচেয়ে বড় সাধনা। সফল হলে পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হত। মাত্র একটা মোমবাতির আগুনের তাপ থেকে কলকাতার মতো মস্ত একটা শহরের যাবতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারত। একটা দেশলাই কাঠির আগুনে এক কেটলি জল ফোটানো যেত। একটুখানি তাপকে বহুগুণ বাড়ানোর এই যন্ত্র তৈরিতে তিনি সফল হয়েছিলেন কিনা তা আজ আর তাঁর মনে নেই। শুধু মনে আছে, যন্ত্রটি যখন প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন, তখন একদিন হঠাৎ এই টেবিলের ধারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন তিনি হাসপাতালে। আর তার পর থেকে কিছুই আর তাঁর তেমন মনে পড়ে না। হিট অ্যামপ্লিফিকেশনের কোনো

কাগজপত্রও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। একেবারে শেষ হওয়ার মুখে এসেও যন্ত্রটা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে আজও।

বাঞ্ছারাম মাথায় হাত দিয়ে যন্ত্রটার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "রসগোল্লা! রসগোল্লার চেয়ে আর কী ভাল থাকতে পারে পৃথিবীতে?"

"আজ্ঞে আছে। রসগোল্লার চেয়েও ভাল জিনিস আছে।" টেবিলের তলা থেকে কে যেন বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

বাঞ্ছারাম বললেন, "হতেই পারে না।"

"সে আপনি আমার খুড়িমার হাতের কচুর শাক খাননি বলে বলতেছেন। খেলে আর বলতেন না।" বলে টেবিলের তলায় পাতা একটা শতরঞ্চির বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রঘু। বাঞ্ছারামের বহু পুরনো চাকর। বেরিয়ে এসে সে একটা হাই তুলে বলল, "আরো আছে। রাজশাহির রাঘবসাই। খেয়েছেন? ঢাকার বাখরখানি?"

বাঞ্ছারাম ধমকে উঠলেন, "রসগোল্লা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাদ্য।"

রঘু রেগে গিয়ে বলল, "সেইজন্যেই তো লোকে আপনাকে পাগল বলে।"

বাঞ্ছারাম কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, "এখনো বলে?"

"বলে বই কী।"

বাঞ্ছারাম চোখ পাকিয়ে বললেন, "আজ বলেছে?"

রঘু মুখ গোমড়া করে বলল, "রোজ বলে। আজই বা বলবে না কেন?"

"তা তুই তাদের কী জবাব দিলি?"

"জবাব দেওয়ার কিছু নেই। আমি তো বরাবরই বলে আসতিছি যে দাদাবাবুটা একটা আস্ত পাগল। তাঁর এই জাদুঘরে ঢুকলে এই যন্তরটা ফোঁস করে, ঐ যন্তরটা ফাঁস করে, এই যন্তরটা

চলতে লাগে, তো আর একটা যন্তর ভূতের নেত্য করে। এই পাগলাঘরের মোড়ল যিনি, তাঁরে পাগল কবো না তো কী ?”

“তাহলে তুইও বলিস ?”

“বলি।”

“আজ বলেছিস ?”

“এই তো বললাম। আপনি একডা পাগল।”

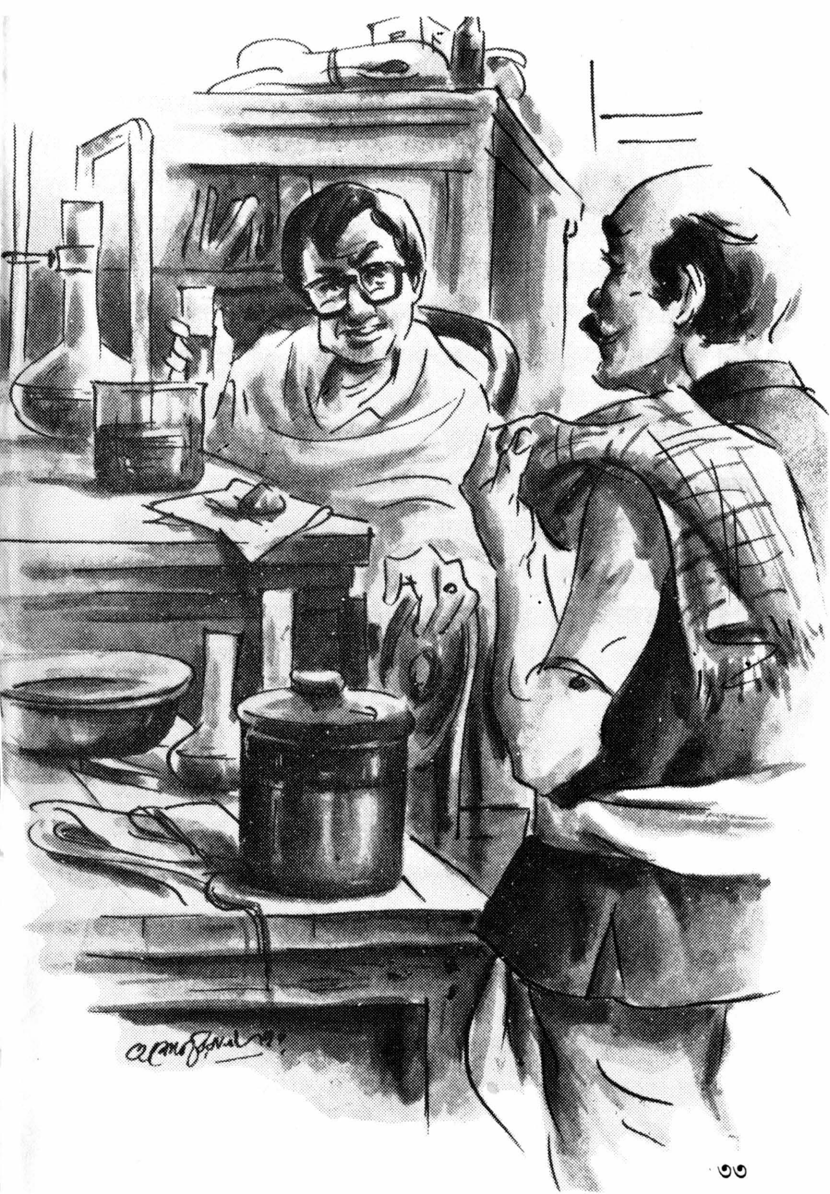
বাঞ্ছারাম কটমট করে রঘুর দিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, “আচ্ছা, যা, আজ ছেড়ে দিলাম। আর কখনো বলিস না।”

রঘু সেই ছেলেবেলা থেকে বাঞ্ছারামের সঙ্গে আছে। তিন কূলে তার আর কেউ নেই। সে লেখাপড়া শেখেনি, আর বাঞ্ছারাম মস্ত পণ্ডিত। তবু রঘু বরাবর প্রায় সর্ব বিষয় নিয়েই বাঞ্ছারামের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করেছে। তাদের মতের মিল নেই। শুধু অন্তরের মিল আছে। রঘু বাঞ্ছারামকে দারুণ ভালবাসে।

রঘু আর একটা হাই তুলে বলে, “বাবামশাইয়ের কথাটা যদি শুনতেন। যদি ওকালতিটা পড়তেন, তবে আজ আর এই অবস্থা হত না। ওকালতির মতো জিনিস আছে ? আমাদের গ্রামের বসন্ত উকিলকে দেখলে দারোগাবাবুও ঘোড়া থেকে নেমে পড়তেন।”

এ-কথা ঠিক যে বাঞ্ছারামের বাবা অক্রূরবাবু চেয়েছিলেন, ছেলে উকিল হোক। বাঞ্ছারাম তা হননি। আর ব্যাপারটা রঘুর বিশেষ ভাল লাগেনি। রঘু সেই নিয়ে রোজই খোঁটা দেয়।

বাঞ্ছারাম তাঁর জল-গাড়ি চালিয়ে ঘরের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে বললেন, “আসলে আমি পাগল নই। আমি আসলে কাজের কথাটা ভুলে যাই। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা মনে পড়ে না। তুই লোককে একটু বুঝিয়ে বলিস তো।”



“কী বলব ?”

“আমি পাগল নই।”

“আচ্ছা বলব। এখন খেয়ে শুয়ে পড়বেন চলুন।”

গভীর রাতে বাঞ্ছারাম বিছানা ছেড়ে চুপি-চুপি উঠে পড়লেন। পা টিপে-টিপে এসে ল্যাবরেটরি খুলে ভিতরে ঢুকলেন। দরজাটা সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন অসম্পূর্ণ হিটি অ্যামপ্লিফায়ারটার সামনে। কী যেন প্রায়ই তাঁর মনে পড়ি-পড়ি করে। কিন্তু একটুর জন্য মনে পড়ে না। স্মৃতিশক্তি বড়ই দুর্বল।

কপালটা ডান হাতের দুই আঙুলে চেপে ধরে ভ্রূ কুঁচকে বাঞ্ছারাম তাঁর সাধের যন্ত্রটার দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর মনে হয়, কেউ যদি তাঁকে যথেষ্ট রসগোল্লা খাওয়ায়, তাহলে তাঁর মাথার এই ধোঁয়াটা কেটে যাবে। কিন্তু কেউই তাঁর কথা শোনে না। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারের নির্দেশ খুবই কড়া।

অনেকক্ষণ কপালটা চেপে ধরে থেকে তিনি একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর যন্ত্রটার সারকিট খুলে বিভিন্ন অংশে হাত বোলাতে লাগলেন।

হঠাৎ ঘাড়ে শিরশির করে একটু হাওয়া লাগল। উত্তুরে হাওয়া। বাঞ্ছারাম ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। ল্যাবরেটরির দরজা-জানালা সবই বন্ধ থাকার কথা। হাওয়া আসবে কোত্থেকে ? অন্যমনস্ক বাঞ্ছারাম উঠলেন। উত্তরের কাচের জানালাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরে তাকালেন একটু। আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডাকছে। একটু কুয়াশাঘেরা জ্যোৎস্না। ভারী রহস্যময়। তাঁর আবার রসগোল্লার কথা মনে পড়ল।

ভাল করে জ্যোৎস্না দেখার জন্য একটু ঝুঁকতেই তাঁর হাতের ঠেলায় জানালার একটা পাল্লা খুলে গেল। বাঞ্ছারাম বিরক্ত

হলেন। পই-পই করে রঘুকে বলা আছে, ল্যাবরেটরির জানালা বা দরজার ছিটকিনি যেন খুলে রাখা না হয়। জানালাটা আবার সাবধানে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগালেন তিনি। তার পর আবার যন্ত্রটার সামনে এসে বসলেন। তাঁর কেবলই মনে হয়, একদিন তাঁর সব কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাবে। আর সেদিন যন্ত্রটাও কাজ করতে শুরু করবে। একটুখানি তাপকে একশ গুন, হাজার গুণ, লক্ষ গুণ, কোটি গুণ বাড়িয়ে তুলতে থাকবে তাঁর এই যন্ত্র। দুনিয়া থেকে তাপ ও বিদ্যুতের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

বাঞ্ছারাম তাঁর সাধের যন্ত্রটার নানা অংশ নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর হাত থেমে গেল, শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। কেন এমন হয় তা বাঞ্ছারাম জানেন। কেউ যদি আড়াল থেকে লুকিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক তখনই এরকম হয়। অন্য কোনো সময়ে এরকমটা হয় না। বাঞ্ছারাম বুঝতে পারলেন, আড়াল থেকে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

কিন্তু কে ?

বাঞ্ছারাম আস্তে-আস্তে নিজের শরীরটাকে চেয়ারে ছেড়ে দিলেন। ঘাড় হেলিয়ে চোখ বুজে রসগোল্লার কথা ভাবতে লাগলেন। ছেলেবেলায় মতি ময়রার দোকানে ভিয়েনঘরে গিয়ে গরম রসগোল্লার একটু রস পাওয়ার আশায় যখন দাঁড়িয়ে থাকতেন তখন চোখে পড়ত, মস্ত কালো এক কড়াইতে টইটম্বুর রস ফুটছে আর তাতে শয়ে শয়ে পিং পং বলের মতো রসগোল্লা লাফাচ্ছে, নাচছে, দুলছে। কী যে সুন্দর সেই দৃশ্য। চোখ বুজে সেই দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখতে লাগলেন বাঞ্ছারাম। দেখতে-দেখতে শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। ঘাড়ে আবার শিরশির করে একটু উত্তুরে বাতাস এসে লাগল। অর্থাৎ উত্তরের জানলাটা আবার

কেউ খুলেছে।

বাঞ্ছারাম ঘাড় ঘোরালেন। অনুচ্চ স্বরে বললেন, "কে ? কে ওখানে ?"

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু বাতাসের ঝাপটায় একটা পাল্লা ঠাস করে বন্ধ হয়ে গেল। বাঞ্ছারাম অবাক হয়ে আপন মনেই বলে উঠলেন, "আশ্চর্য ! আমি কি পাগল হয়ে গেলাম নাকি ? জানালাটা এইমাত্র বন্ধ করে দিয়ে এলাম, নাকি করিনি ?"

বাঞ্ছারাম আবার উঠলেন। জানালার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। মাথাটা তাঁর একেবারেই গেছে। যাঃ বাবা ! দরজাটাই যে বন্ধ করতে ভুলে গেছেন ! ল্যাবরেটরির দরজার দুটো পাল্লাই হাঁ হাঁ করছে খোলা !

দরজার দিকে এগোতে গিয়ে বাঞ্ছারামকে আবার থমকাতে হল। দরজার পাল্লা দুটো সাবধানে বন্ধ করে দিল কে যেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না।

বাঞ্ছারাম আপনমনেই হাসলেন। রঘু যে তাঁকে পাগল বলে, সে তাহলে এমনিতে নয় ! পাগল তাহলে তিনি বটেন ! কথাটা ভেবেই বাঞ্ছারাম খুব হোঃ হোঃ করে হাসলেন। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল।

খানিকক্ষণ হেসে নিয়ে গায়ের আলোয়ানে চোখের জল মুছে সামনে তাকিয়ে দেখেন সামনের টেবিলে কাচের মস্ত বকযন্ত্রটার পাশে একটা ডলপুতুল দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব ডলপুতুল, মাথায় টুপি, পরনে স্যুট, গলায় টাই, চোখের তারা কটা।

বাঞ্ছারাম আবার হেসে উঠতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ডলপুতুলটা ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে চাপা স্বরে বলল, "শাট আপ !"

কথা-কওয়া পুতুল নাকি ? বাঞ্ছারাম খুশিই হলেন। তাঁর একটা ছেলে আছে। ছেলেটা কত বড় হয়েছে তা তাঁর জানা

নেই। তবে ছেলের নাম যে রতন, তা তাঁর মনে আছে। এই ডলপুতুলটা রতনকে দেবেন। ছেলেটা খুশি হবে। এই ভেবে বাঞ্ছারাম পুতুলটার দিকে হাসি-হাসি মুখ করে এগিয়ে গেলেন। বেশ পুতুল। কথা কয়, হাত-পা নাড়ে।

বাঞ্ছারাম হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু পুতুলটাকে ধরতে পারলেন না। তার আগেই পিছন থেকে একটা ভারী হাত তাঁর ঘাড়টা চেপে ধরল। এরকম জোরালো হাত কারো থাকতে পারে, তা বাঞ্ছারামের জানা ছিল না। ঘাড়ে ধরে হাতটা প্রায় তাঁকে শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও পারলেন না বাঞ্ছারাম। গলা বুজে এল, চোখে অন্ধকার দেখলেন, মাথাটা পাক খেল। দাঁড়ানোর পরও টলমল করে পড়ে যাচ্ছিলেন। সেই হাতটা তাঁর ঘাড় ধরে আছে বলে পড়লেন না। মুখটা ঘোরাতে পারছিলেন না বাঞ্ছারাম। তবে একপলক আবছা দেখলেন, যে-লোকটা তাঁর ঘাড় ধরে আছে সে অন্তত ছ ফুট তিন-চার ইঞ্চি লম্বা এবং বিশাল তার স্বাস্থ্য। একখানা আস্ত দানব।

এমনিতেই বাঞ্ছারামের মাথার ঠিক নেই, এখন ভয়ে আরও গুলিয়ে গেল। এ কি দুঃস্বপ্ন ?

টেবিলের ওপর দাঁড়ানো ডলপুতুলটা গম্ভীরভাবে তাঁকে দেখছিল। বাঞ্ছারাম দম ফিরে পেয়ে যখন হাঁফাচ্ছেন, তখন পুতুলটা তীক্ষ্ণ স্বরে ইংরিজিতে বলল, "সেই জিনিসটা কোথায় ?"

বাঞ্ছারাম এবার ভাল করে ঠাহর করে বুঝলেন, সামনের ডলপুতুলটা আসলে পুতুল নয়। বেঁটে একটা লোক। এত বেঁটে যে, প্রায় বামনবীর বলে মনে হয়। কিন্তু বামনদের চেহারায় যেমন মাঝে-মাঝে বিকৃতি দেখা যায়, এর তেমন নয়। বেঁটে হলেও এর চেহারাটা বেশ সুষম গঠনের। বয়সও খুব বেশি নয়।

বাঞ্ছারাম হাঁফাতে-হাঁফাতে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন জিনিসটা ?"

"হিট অ্যামপ্লিফিকেশনের সারকিট ডিজাইন। আমরা তোমাকে মোট দশ মিনিট সময় দেব। চটপট সেটা বের করে দাও।"

বাঞ্ছারাম চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকেন। কিছুই মনে পড়ে না তাঁর। শুধু মনে হয়, এখন তাঁর কিছু রসগোল্লা খাওয়া দরকার। বুকটা ধড়ফড় করছে, শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, ঘাড়টা টনটন করছে। রসগোল্লা খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি কঁকিয়ে উঠে বললেন, "গিভ মি সাম রসগোল্লা।"

কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘাড়ে আর-একটা ঝাঁকুনি। এত জোর সেই ঝাঁকুনি যে, বাঞ্ছারাম কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারালেন প্রবল যন্ত্রণায়।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখেন, তিনি চেয়ারে বসে আছেন। সামনে আর-একটা চেয়ারে সেই বেঁটে সাহেব। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রকাণ্ড দানব। দানবটার হাতে একটা রবারের দেড় হাত লম্বা পাইপ।

বেঁটে লোকটা বলল, "সেটা কোথায় ?"

"কোন্‌টা ?" থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করেন বাঞ্ছারাম।

"হিট অ্যামপ্লিফিকেশনের ডিজাইন আর ফরমুলা ?"

"নেই। আমার কাছে নেই। আমি রসগোল্লা খাব।"

চোখের পলকে দানবটা এগিয়ে এগিয়ে এল। রবারের হোসটা মুখের সামনে নাচিয়ে হিন্দিতে বলল, "পাগলামি একদম সারিয়ে দেব। মারের চোটে সব পাগলামি সেরে যাবে। বুঝলে ? ঠিক-ঠিক বাতচিত করো। সাহেব যা জানতে চাইছে, তার জবাব দাও।"

বাঞ্ছারাম ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর যে কিছু

মনে নেই ! তিনি কী করবেন ?

বেঁটে সাহেবটা ধীর গম্ভীর স্বরে একটু ভাঙা ইংরিজিতে বলল, "শোনো ব্যানার্জি, রবিন তোমার ফরমুলা পায়নি। তোমার ফরমুলা তোমার কাছেই আছে। আমরা জানি। বাঁচতে চাও তো বের করে দাও। নইলে তোমার চোখের সামনে আগে তোমার ছেলেকে আমরা খুন করব। তারপর ধীরে-ধীরে, অনেক কষ্ট দিয়ে তোমাকেও।"

বাঞ্ছারাম অস্থির বোধ করলেন। বললেন, "আমার ছেলে যে ছোট্ট। তাকে মারবে ? তাকে মারবে কেন ?"

বেঁটে লোকটা একটু হাসল। ক্রূর হাসি। বলল, "তোমার ছেলে মোটেই ছোট নয়। যথেষ্ট বড়। নাম-করা বক্সার।"

বাঞ্ছারাম মাথা নেড়ে বললেন, "আমার ছেলেকে তোমরা মেরো না। ফরমুলা নিয়ে যাও।"

"সেটা কোথায় আছে ?"

"বোধহয় ওই আলমারিতে। ওই যে লোহার আলমারি। খোলাই আছে।"

বেঁটে লোকটা চোখের ইঙ্গিত করল। দানবটা গিয়ে আলমারি খুলল। পুরনো কাগজপত্র আর কিছু ফাইল আজও অযত্নে পড়ে আছে চারটে তাকে। দানবটা ঝটপট সব কাগজপত্র নামাল। ঘন্টাখানেক ধরে তন্ন-তন্ন করে খুঁজল। তারপর রক্ত-জল-করা ভয়াল চোখে তাকাল বাঞ্ছারামের দিকে।

বেঁটে লোকটার ভুরু কোঁচকানোই ছিল, এবার হঠাৎ চোখে একটা রাগের বিদ্যুৎ খেলে গেল। চাপা গলায় চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "জিনিসটা আলমারিতে নেই। তুমি কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছ ?"

বাঞ্ছারাম নিজের কপাল টিপে ধরে ভয়ার্ত গলায় বললেন,

"আমার যে কিছু মনে থাকে না। কী করব ?"

দানবের মতো লোকটা রবারের হোস হাতে এগিয়ে এল। বাঞ্ছারাম ভয়ে কুঁচকে যাচ্ছিলেন। চোখে অবোধ দৃষ্টি। কিছুতেই মনে পড়ছে না, ফরমুলাটা কোথায় রেখেছেন।

দানবের হাতের রবারের হোসটা তাঁর বাঁ হাতে একটা মুগুরের মতো এসে লাগল। বাঞ্ছারামের মনে হল হাতটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল বুঝি। কনুই থেকে সমস্ত হাতটা অসাড় হয়ে ঝিনঝিন করতে লাগল। চোখে লাল নীল হলুদ ফুলঝুরি দেখতে লাগলেন। "বাবা গো" বলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করলেন। মুখটা বেঁকে গেল ব্যথার তাড়নায়। ঠোঁট দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোতে লাগল। চোখ উল্টে গেল।

দানবটাই ট্যাপ থেকে এক কোষ জল এনে ঝাপটা দিলে মুখে। বাঞ্ছারাম চোখ খুললেন। বেঁটে লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তোমার মতো বিখ্যাত লোককে মারধোর করতে আমাদের খারাপ লাগছে। কিন্তু এটাও সত্যি যে, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছ। তোমার আবিষ্কার যদি তোমার কাছেই লুকোনো থাকে, তবে তা দিয়ে পৃথিবীর মঙ্গল হবে না। পৃথিবীর স্বার্থেই তোমার আবিষ্কারটা আমাদের জানা দরকার।"

বাঞ্ছারাম ছেলেমানুষের মতো আদুরে গলায় বললেন, "আমি দিদির কাছে যাব। আমি রসগোল্লা খাব।"

বেঁটে সাহেবটা রসগোল্লা চেনে না। বয়স্ক লোকের দিদির কাছে যাওয়ার বায়নাও তার বোঝার কথা নয়। উপরন্তু বাঞ্ছারাম কথাটা বললেন বাংলায়। তারপর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

শত্রুপক্ষ তাঁকে কাঁদার জন্য মিনিট পাঁচেক সময় দিল। তারপরই দানবটা এসে তাঁর ডান কব্জিটা চেপে ধরল। কিন্তু তা

সাধারণ চেপে ধরা নয়। যে কায়দায় ধরল, তাকে বলে জুডোস থাম্ব লক। শিরা স্নায়ু ইত্যাদি নিরিখ করা ধরা। একটু চাপ দিলেই গা দিয়ে ঘাম ছাড়ে, প্রাণ বলে পালাই-পালাই, শরীর থর-থর করে কাঁপতে থাকে। চাপ আর-একটু বাড়ালে যে-কোনো মজবুত কব্জি ভেঙে বা অকেজো হয়ে যেতে পারে। বাঞ্ছারাম মূক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। এই শীতেও তাঁর পাঞ্জাবি ভিজে গেল ঘামে। মাথা ঘুরতে লাগল, বমি-বমি ভাব হতে লাগল।

দানবটা বলল, "বলো ! বলো ! শিগগির বলো !"

কিন্তু কী বলবেন বাঞ্ছারাম ? তাঁর পাগলাটে মাথায় ঘোলা জলের মতো আবছা হয়ে গেছে স্মৃতি। তাঁর ঠোঁট নড়তে লাগল। তিনি বলতে চাইলেন, "মেরো না ! আর মেরো না ! ছেড়ে দাও।"

আবার বুকের ওপর মাথা ঝুঁকে পড়ল বাঞ্ছারামের। মুখে গ্যাঁজলা। চোখ ওল্টানো। আবার জলের ঝাটকা।

কিন্তু জ্ঞান ফিরলেও আতঙ্কে বাঞ্ছারাম বোধবুদ্ধিহীন হয়ে গেছেন। তার ওপর শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। ঘাড় ছিঁড়ে পড়ছে, দুটো হাতই অনড় হয়ে গেছে ব্যথায়। চোখ-ভরা জল।

বেঁটে লোকটা চেয়ার থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, "আমরা খবর রাখি, তোমার পাগলামিটা অভিনয় মাত্র। অনেক দিন ধরেই তুমি পাগল সেজে আছ। কাজেই আমাদের সঙ্গে অভিনয়ের চালাকি কোরো না। মনে রেখো, এখানেই ব্যাপারটা শেষ হবে না। আমরা তোমার ছেলেকে তোমার সামনে খুন করব। আর আমরা যা বলি, তাই করি।"

বাঞ্ছারাম ককিয়ে উঠলেন বিভীষিকা দেখে। গোঙাতে গোঙাতে বললেন, "ফরমুলাটা কোথাও আছে। আমার ছেলেকে

মেরো না। বড় ছোট্ট ছেলে, মা-মরা দুঃখী ছেলে। তাকে মেরো না।"

বেঁটে লোকটা কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, "তোমাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছি। কাল ঠিক এই সময়ে আমরা আসব। রাত দেড়টা নাগাদ। যদি তখন আমরা জিনিসটা হাতে না পাই, তাহলে যা হওয়ার তাই হবে। পুলিসকে বা আর কাউকে খবর দিও না। তাতে লাভ নেই।"

বাঞ্ছারাম মাথা নাড়লেন। মুখে কথা আসছিল না।

বামন আর দানব নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

পরদিন যখন ল্যাবরেটরিতে এসে তাঁকে আবিষ্কার করল রঘু, তখন তাঁর একশ তিন ডিগ্রী জ্বর। চোখ টকটক করছে লাল। অবিরল ভুল বকছেন, "রতনকে ওরা মেরে ফেলবে। ফরমুলাটা কোথায় ? ফরমুলাটা ?"

ডাক্তার এসে ওষুধ দিল। তাঁর হাতে পায়ে কোনো কালশিটে বা চোখে পড়ার মতো মারের দাগ নেই। শুধু দুটো হাতই আড়ষ্ট আর সামান্য ফোলা। ডাক্তার তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে চলে গেল।

দুপুরে ঘুম ভাঙল বাঞ্ছারামের। জ্বর একটু কম, ব্যথা থাকলেও অসহ্য নয়। ঘুম থেকে জেগে অসহায়ের মতো সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। কী করবেন ? ফরমুলাটা যে কোথায়, তা তাঁর জানা নেই।

বাঞ্ছারাম কষ্টেসৃষ্টে উঠলেন। তারপর ল্যাবরেটরিতে এসে চুপ করে বসে রইলেন। খুব মন দিয়ে ভাববার চেষ্টা করলেন বহুদিন আগেকার ঘটনাটা। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না।

রাতে খেয়ে-দেয়ে শুতে গেলেন। কিন্তু ঘুম এল না। গভীর রাতে চুপিচুপি উঠে এলেন ল্যাবরেটরিতে। অন্ধকার

ল্যাবরেটরি। দরজায় আজ তালা নেই। কেবল ভেজানো। ভিতরে পা দিলেন। আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, কিন্তু ছুঁতে পারলেন না। তার আগেই একটা তোয়ালে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরল। তিনি জ্ঞান হারালেন।

রতন যখন সকালবেলায় বাড়িতে এসে পৌঁছল, তখন পাড়া-প্রতিবেশী এবং পুলিস জমা হয়েছে। বুড়ি পিসি চুপ করে বসে আছে। রঘু হাপুস নয়নে কাঁদছে। রতনকে দেখে কান্না বাড়ল। "খোকাবাবু গো, কর্তাকে কারা গুম করেছে।"

সদ্য জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাড়ি ফেরার আনন্দ মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। তবু পিসি বা রঘুর মতো ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া বা ভেঙে পড়ার মানুষ নয় সে। সকলের এলোমেলো কথা থেকে যা বুঝল, তা হল, ভোরে রোজকার মতো ল্যাবরেটরি ঝাড়ু দিতে এসে রঘু দেখে, তালাটা ভাঙা, ঘরের জিনিসপত্র ছত্রখান আর বাঞ্ছারামের চশমাজোড়া পড়ে ভেঙে আছে। তিনি কোথাও নেই। বাঞ্ছারামের প্রাতঃভ্রমণ করার অভ্যাস নেই। বলতে কী, গত এক বছর তিনি বাড়ির বাইরে একা কখনোই যাননি।

পুলিসের অবশ্য ধারণা, তিনি কোথাও গেছেন এবং ফিরে আসবেন। যাদের মাথা খারাপ, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চয় করে তো কিছু বলা যায় না।

রতনকে দেখে পিসির থতমত ভাবটা খানিক বাদে কেটে যাওয়ার পর পিসি বলল, "যত যাই হোক, আমাকে না বলে সে কোথাও যাওয়ার মানুষ নয়। শরীরটাও খারাপ ছিল।"

রতনের মা নেই। বাবাকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। এই খবরে সে গুম হয়ে গেল। খড়্গপুরে জন এবং রোলোর সঙ্গে আলাপ না হলে সেও পুলিসের মতোই ধরে নিত, বাবা কোথাও বেড়াতে গেছেন এবং এসে যাবেন।

রতন রঘুকে জিজ্ঞেস করল, "রঘুদা, কিছু চুরি গিয়েছে বলে জানো ?"

রঘু বলল, "তা সেই যন্তরটা তো দেখছি না !"

"কোনটা ? হিট অ্যামপ্লিফায়ার ?"

"সেইটেই।"

রতন নিঃশব্দে ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকল। সে ডিটেকটিভ নয়। সূত্রানুসন্ধানের চোখও তার নেই। তার বাবার শরীর খুব





খারাপ যাচ্ছিল। বিছানা থেকে ওঠেননি। অথচ আজ সকালেই তিনি নিজে থেকে কোথাও চলে যাবেন এটা বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। উপরন্তু অত বড় হিট অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রটাই বা যাবে কোথায়? সে তন্ন তন্ন করে চারদিক খুঁজল। চোরেরা তাদের আগমন তেমন গোপন করেনি। অনেকগুলি কাগজপত্র মেঝেয়

পড়ে আছে। লোহার আলমারির একটা পাল্লা এখনো খোলা। টেবিলের ড্রয়ার হাঁটকানো। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট ওল্টানো। খুব রুক্ষ হাতে এবং বেপরোয়াভাবে কেউ ঘরটা সার্চ করেছে। অর্থাৎ তার বাবাকে যদি কেউ গুম করে থাকে, তবে যারা সে-কাজ করেছে তারা বুক ফুলিয়েই করেছে। এর বেশি আর কিছু রতন বুঝতে পারল না।

রতনের বন্ধু-বান্ধবরা সে এসেছে শুনে দেখা করতে এসেছিল। রতন তাদের সঙ্গে বেশি কথা-টথা বলল না। তার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে রাগে আর অসহায়তায়। কিন্তু গায়ের জোরে এই রহস্যের কিনারা হওয়ার নয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, বুদ্ধি খাটাতে হবে।

বেলা গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। তার মধ্যে অন্তত বার পাঁচেক থানায় হানা দিল রতন। দারোগা-পুলিসরা নানা অপরাধীকে সামলাতে ব্যস্ত। বাঞ্ছারামের খবর তারা পায়নি।

বাবার কী অসুখ হয়েছিল তা পিসি আর রঘুর কাছে জানতে চাইল রতন।

রঘু বলল, "তা তো জানি না। সারারাত ঐ জাদুঘরেই বসে ছিলেন। সকালে আমি গিয়ে যখন কাণ্ডখানা দেখি, তখন গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, চোখ টকটকে লাল। ভুলভাল বকছেন।"

"কী বলেছিল মনে আছে?"

রঘু মাথা চুলকে বলল, "একে পাগল, তায় জ্বরের ঘোরে আবোল তাবোল কথা সব বেরোচ্ছিল মুখ দিয়ে। আমার অত স্মরণ নেই।"

"একটু স্মরণ করার চেষ্টা করো বাপু।"

রঘু ভেবে-চিন্তে বলল, "একবার যেন বলছিলেন বেঁটে লোকটা

ভীষণ শয়তান। ওরা খোকাকে মেরে ফেলবে। খুব সাবধান।”

“আর কিছু?”

“না। ঐ কথাটাই ঘুরে-ফিরে কয়েকবার বলেন। তারপর ‘ও দিদি, রসগোল্লা খাব, স্নান করব না,’ এইসব বলতে লাগলেন।”

রসগোল্লা খাওয়ার কথাটা বাঞ্ছারামের মুদ্রাদোষের মতো ছিল, কাজেই তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তবে ‘বেঁটে লোক’ এবং ‘খোকাকে মেরে ফেলবে’ এই কথা দুটোর মধ্যে কিছু সূত্র থাকতে পারে। থানায় গিয়ে সে কথাটা দারোগাবাবুর কাছে বলল।

ও-সি ব্যস্ত মানুষ। তবু সদ্য জাতীয় চ্যামপিয়নশিপের খবরটা আজই কাগজে পড়েছেন, রতনের ছবিসহ। তাই বেশ খাতির করে বসতে দিলেন। বললেন, “ওসব প্রলাপ লোকে জ্বর হলে বলেই থাকে। ও থেকে কিছু আন্দাজ করা শক্ত।”

রতন গম্ভীর গলায় বলল, “তবু আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন কোনো বেঁটে লোককে এই অঞ্চলে দেখা গেছে কি না।”

ও-সি হেসে বললেন, “বেঁটে বা লম্বা লোকের অভাব কী? তবু আপনি যখন বলছেন, দেখব খুঁজে।”

এরপর রতন তার বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরটা টেলিফোনে খবরের কাগজের অফিসগুলিতেও জানিয়ে দিল। বাঞ্ছারাম একসময়ে নাম-করা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। খবরটা ওরা ছাপতেও পারে।

রতন এখন বুঝতে পারছে, জন খুব মিছে কথা বলেনি। তার বাবার আবিষ্কারটা হয়তো তেমন এলেবেলে ব্যাপার ছিল না এবং হয়তো সেই কাজে তিনি সাফল্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। হয়তো সফল হয়েও ছিলেন। জন লোকটাকেও তার খুব বিশ্বাস হয় না। তাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায় জন,

সঙ্গে বাবাকেও। এই প্রস্তাবটাও সন্দেহজনক। বক্সার হিসেবে রতন যত ভালই হোক, আমেরিকার পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের জগতে সে এক টিপ নস্যি। সেখানকার বক্সাররা ক্ষুরধার দক্ষ। বক্সিংয়ের অনেক মুষ্টিযোগ তারা জানে। রতনকে দিয়ে তাই জন সেখানে ব্যবসা সহজে জমাতে পারবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি রতনের বাবা বাঞ্ছারামকে সে হাতের মুঠোয় পায়, তাহলে তার লাভ অনেক বেশি।

জগতের লোভ লালসা নিষ্ঠুরতার হাত থেকে নিজের অসহায় বাবাকে বাঁচানোর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না রতন। রাতে সে ভাল করে খেল না। ঘুমোতে পারল না।

মাঝরাতে উঠে তার বাবা মাঝে-মাঝে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে বসতেন। এটা তাঁর নেশার মতো ছিল।

গভীর রাতে রতনও বিছানা ছেড়ে উঠল। একটা আলোয়ান জড়িয়ে ধীরে-ধীরে গিয়ে ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। আলো জ্বেলে বাবার চেয়ারটায় চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না। বাবার জন্য দুশ্চিন্তায় মাথা পাগল-পাগল লাগছে।

বসে থাকতে থাকতে একটু ঝিমুনি এসেছিল বোধহয়, হঠাৎ শিরশিরে ঠাণ্ডা একটা বাতাস তার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিতেই সে চোখ মেলল। বক্সিং করে বলেই তার স্নায়ু সতেজ ও সজাগ। সমস্ত শরীরটা চোখের পলকে চিতাবাঘের মতো তৈরি হয়ে গেল।

এক লাফে রতন দরজার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই দরজাটা আস্তে খুলে গেল। রতন অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ায়। চৌকাঠে হাসিমুখে জন দাঁড়িয়ে।

"তুমি !" তেতো গলায় রতন বলে।

জন মাথা নেড়ে বলল, "আমিই। এ ফ্রেন্ড। তুমি কি ভয় পেয়েছ ?"

রতনের মাথার মধ্যে নানারকম কথা আসছে। জন যে সাদাসিধে লোক নয় তা সে খড়্গপুরেই টের পেয়েছিল। এখানে তার মাঝরাতে হঠাৎ আগমনও নিশ্চয়ই সাধু উদ্দেশ্যে নয়। রতন চাপা স্বরে বলল, "কেন এসেছ ? কী চাও ?"

জন হাসিমুখেই বলে, "উত্তেজিত হোয়ো না। সত্যি বটে যে, আমি অনেকটা চোরের মতোই এসেছি। তুমি যে এখানে থাকবে, তা আমার জানা ছিল না।"

রতন রাগে ফুঁসছে। ঘন-ঘন শ্বাস ছাড়ছে। কে বা কারা তার বাবাকে নিয়ে গেছে, তা সে জানে না। কিন্তু ঘটনাটায় জনের হাত থাকতেই পারে। জন ছাড়া তার বাবার ব্যাপারে কাউকেই সে আগ্রহী হতে দেখেনি। দাঁতে দাঁত পিষে সে বলল, "আমার বাবাকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে তা তুমি জানো ?"

জন সত্যিকারের অবাক হয়। তার সাদা মুখ আরো সাদা হয়ে যায় হঠাৎ। অপলক চোখে সে কিছুক্ষণ রতনের দিকে চেয়ে থেকে বলে, "তোমার বাবাকে চুরি করেছে ? কী আশ্চর্য ব্যাপার !"

কিন্তু জনের কথাবার্তায় প্রতিক্রিয়ায় একটু উঁচুদরের অভিনয় রয়েছে বলে মনে হয় রতনের। তার অসহায় বুড়ো পাগল বাবাকে নিতান্ত ব্যবসায়িক কারণে চুরি করে নিয়ে গিয়ে এরা না জানি কত কষ্ট দিচ্ছে। রতনের মাথার ঠিক ছিল না। হঠাৎ সে ফিসফিস করে বলল, "ন্যাকামি কোরো না জন। তুমি খুব ভালই জানো।"

জন একটা হাত বাড়িয়ে রতনের কাঁধ ধরে বলল, "তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না জানি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য খারাপ কিছু

নয়।”

“খারাপ নয়? তবে এত রাতে চুরি করে আমার বাবার ল্যাবরেটরিতে ঢোকার মানে কী?”

জন এ-কথার জবাব দিতে পারল না। শুধু মাথা নেড়ে বলল, “আমি দুঃখিত, তোমরা ভারতীয়রা বড্ড বেশি আবেগপ্রবণ। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারতে আমি চোর নই।”

“আলবাত চোর। বাবার গবেষণা হাত করার জন্য আমার বাবাকে তুমি চুরি করেছ।”

জন একটা ধমক দিল। “শাট আপ রতন!”

এইটুকু প্ররোচনারই প্রয়োজন ছিল। শুকনো বারুদে আগুন লাগলে যেমন হয় তেমনি একটা রাগ জ্বলে উঠল রতনের ভিতরে। গায়ের আলোয়ানটা এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে সে বাঁ হাতে বিষাক্ত একটা ঘুষি মারল জনের মুখে। সেই ঘুষি সহ্য করার মতো বেশি মানুষ নেই। জন “ওফ” শব্দ করে ছিটকে পড়ল দরজার পাল্লায়। তারপর গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের অন্ধকার বারান্দা থেকে দরজার চৌকাঠে উদয় হল রোলো। এক পলক সে জনের নিথর শরীরটার দিকে চেয়ে রইল, তারপর মুখ তুলে তাকাল রতনের দিকে। দুটো চোখ ধকধক করছে হিংস্রতায়।

কিন্তু রোলো তাড়াহুড়ো করল না। ধীর পায়ে জনকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল, তারপর নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘুরে রতনের মুখোমুখি হল সে। মুখে কথা নেই। কিন্তু তার দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখেই বোঝা যায় সে কী চাইছে।

রতনও তাই চায়। বাবার জন্য তার দুঃখ এবং আক্রোশ তাকে পাগল করে তুলেছে। সে চায় প্রতিশোধ। হিংস্র চোখে সেও রোলোর চোখে চাইল। মুখোমুখি রক্তলোলুপ দুই বাঘ।

একটা কি দুটো সেকেন্ড পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল তারা। তারপরই পিছল সাপের মতো রোলো এগিয়ে আসে। দুর্বোধ একটা শব্দ করে মুখে। তার বাঁ হাত এত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসে যে, রতন হাতটা ভাল করে দেখতেই পায় না। সুব্বাও এত দ্রুত ঘুষি মারতে পারে না নিশ্চয়ই। কিন্তু রতনের রিফ্লেক্স খুব ভাল কাজ করছে আজ। সে চকিতে তার মাথা সরিয়ে নেয়। এক কদম সরে যায় ডাইনে। তারপর একটা ক্রস চালায় রোলোর কানের পাশে। আশ্চর্য! রোলো রতনের দিকেই চোখ রেখেছিল। ইচ্ছে করলে ঘুষিটা এড়াতেও পারত, কিন্তু সে চেষ্টা করল না। কিন্তু রতন টের পেল তার ঘুষিটা যেন একটা শক্ত পাথরের দেয়ালে গিয়ে লাগল। কবজি চিনচিন করে উঠল ব্যথায়। যে ঘুষিতে ভারতের যে কোনো প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধার পড়ে যাওয়া উচিত, তা অনায়াসে হজম করে রোলো ফিরে দাঁড়াল।

রতন দেখল রোলোর গার্ড নেই। এই সুযোগ। সে চকিত পায়ে নিজেকে গুছিয়ে অ্যাটাকিং পোজিশনে সরে এসে ডান পা বাড়িয়ে দুর্দান্ত একটা সোজা ঘুষি চালাল রোলোর মাথায়। রতনের কনুই শরীরে লাগানো ছিল ঘুষি মারবার সময়। শরীরের ওজনটাকে সে ঘুষিতে সঞ্চার করতে পেরেছে। লাগলে বোমার মতো কাজ হত। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে রোলো সীল মাছের মতো একটা গোঁত খেয়ে নিচু হয়ে ঘুষিটা ভাসিয়ে দিল মাথার ওপর। আর সেই নিচু কুঁজো অবস্থা থেকেই ছোট্ট একটা জ্যাব করল রতনের পাঁজরে।

ককিয়ে উঠল রতন। একটা জ্যাব যে কী সাংঘাতিক জোরালো হতে পারে তা তার এতকাল ধারণা ছিল না। পাঁজরে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তবু রতন তো

বক্সার। বহু মার খেয়েছে। এক লাফে অনেকটা পিছিয়ে গেল সে। পায়ের কাজে রোলোর বাড়ানো ঘুষিগুলোর কয়েকটা এড়িয়েও গেল। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল, রোলো তার চেয়ে বা সুব্বার চেয়ে বা ভারতের সেরা যে কোনো বক্সারের চেয়েও অনেক বেশি দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড রতন নিজেকে বাঁচাতে পারল। তারপরই নানা দিক থেকে বিষাক্ত সাপের ছোবলের মতো রোলোর ঘুষি এসে পড়তে লাগল।

রতনের কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। ঠোঁটে ঢুকে গেছে দাঁত। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু সেও বার-বার তার প্রতিপক্ষের মুখে মাথায় তার ঘুষি জমিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু রোলোর রাক্ষুসে ঘুষির তুলনায় তার ঘুষি নিতান্তই দুর্বল। শুধু রোলোর বাঁ ভ্রূর ওপর একটা জায়গা একটু কেটে সামান্য রক্তপাত হচ্ছে। সেও হচ্ছে হাতে গ্লাভস না থাকার দরুন। তা ছাড়া রোলোর আর কিছুই হয়নি।

রতন ক্রমে-ক্রমে পিছু হটছে। সরে যাচ্ছে ঘরের কোণের দিকে। আসলে সরছে না। রোলোই তাকে কূট কৌশলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে রতন পালাতে পারবে না। উপর্যুপরি ঘুষি এসে পড়ছে তার মাথায় মুখে চোয়ালে। এক একবার সে কনুই বা বগলে চেপে ধরেছে বটে রোলোর হাত। কিন্তু পরমুহূর্তেই রোলো ছাড়িয়ে নিচ্ছে নিজেকে। সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক হল রোলোর ডাবল অ্যাকশন পাঞ্চ। একই সঙ্গে ঘুষি এবং কবজির মার।

শেষ পর্যন্ত লড়াই কোথায় গড়াত কে জানে। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ স্বর ডাকল—"রোলো ! স্টপ !"

রোলো থামল। ক্রূর চোখে রতনের দিকে একবার চেয়ে

আস্তে-আস্তে পিছিয়ে গেল। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে বাঁ ভ্রূর ওপরে কাটা জায়গাটায় চেপে ধরল।

রতন হাঁফাচ্ছিল। জীবনে কখনো সে কারো কাছে এক নাগাড়ে এত মার খায়নি। এরকম শক্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে অবশ্য পাল্লাও দিতে হয়নি তাকে। কিন্তু সে আজ বুঝতে পারল, বক্সিং-এর এখনো অনেক কিছুই তার অজানা।

জন উঠে দাঁড়িয়েছে। ডান চোয়ালটা এখনো লাল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে একটু হাসল। তারপর রতনের দিকে চেয়ে বলল, "কনগ্র্যাচুলেশনস, রতন। আমি আজ পর্যন্ত রোলোর সঙ্গে এতক্ষণ কাউকে লড়াই চালিয়ে যেতে দেখিনি।"

রতন বেসিনে উপুড় হয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিল কিছুক্ষণ। দম ফিরে পেয়ে সে বলল, "রোলো খুব ভাল বক্সার। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে, তোমরা ভাল লোক।"

জন একটা টেবিলের ওপর উঠে বসে বলল, "আমরা তা প্রমাণ করতে ব্যস্ত নই। কারণ হয়তো আমরা তেমন ভাল লোক নইও। আইনের চোখে অন্তত নয়। তবে আমাদের উদ্দেশ্য খারাপ নাও হতে পারে।"

"কী করে বুঝব ?" রতন ফুঁসে উঠে বলে।

জন হাত তুলে তাকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করে মৃদু স্বরে বলে, "তোমার বাবাকে আমরা চুরি করিনি। এটা বিশ্বাস করো। তাঁকে চুরি করে আমাদের লাভ হত না। ডাকাত আর বিপ্লবীদের মধ্যে একটু তফাত আছে।"

"কারা ডাকাত ?" রতন জিজ্ঞেস করে।

"যারা তোমার বাবাকে চুরি করেছে। কিন্তু তার আগে ঘটনাটা আমাকে বলো। আমাকে বুঝতে দাও কী হয়েছে। শুধু গায়ের

জোরে সব সমস্যার সমাধান করতে যেও না।”

লজ্জিত হয়ে রতন একটু হাসল।



কুয়াশার ভিতর দিয়ে ভোর রাতে একটা স্পীডবোট চলেছে। বাসন্তী পেরিয়ে বাঁ ধারের নদীর ভিতরে ঢুকে গেল স্পীডবোট। মারাত্মক তার গতি। পিছনে সমুদ্রের মতো ঢেউ তুলে জলকে উথালপাথাল করে প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে ধেয়ে যাচ্ছে ফাইবার গ্লাসের তৈরি অদ্ভুত জলযানটি। হুইল ধরে বসে আছে দানবাকৃতি একটি লোক। শক্তিশালী সার্চলাইটের আলোয় সামনেটা উদ্ভাসিত।

ড্রাইভারের কেবিনের পিছনে ছোট্ট একটা কুঠুরি। এক ধারে স্পঞ্জ রবারের বিছানায় বাঞ্ছারাম অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। পাশে একটি হেলানো চেয়ারে বসে বেঁটে লোকটা কিছু কাগজপত্র দেখছে। এইসব কাগজ বাঞ্ছারামের ল্যাবরেটরি থেকে চুরি করে আনা। কিন্তু কাগজপত্রে কিছু নেই। লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তিতে মাথা নাড়ল। তারপর ঘৃণাভরে একবার তাকাল বাঞ্ছারামের দিকে।

আচমকাই লঞ্চের গতি কমে গেল। গর্জনশীল ইঞ্জিন মৃদু পুটপুট শব্দ করছে। হুইল থেকে মুখ ফিরিয়ে দানব বলল, “জলপুলিশ। আমাদের থামতে বলছে। কী করব ?”

বেঁটে লোকটা ভ্রূ কুঁচকেই ছিল। বিরক্তির গলায় বলল, “স্পীড কমিয়ে দাও। দ্যাখো ওরা কী চাইছে।”

"যদি সার্চ করতে চায় ?"

"সার্চ করতে দেবে। আগে লাইসেন্স দেখাও। বলো যে, একজন বিদেশী সাংবাদিককে সুন্দরবন দেখাতে এনেছ। আর তোমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট অসুস্থ হয়ে কেবিনে শুয়ে আছে।"

"ঠিক আছে।"

বেঁটে লোকটা আবার কাগজপত্র দেখতে লাগল। কেবিনে মৃদু আলো জ্বলছে। বোটটার গতি আরো মন্থর হয়ে গেল। দানবটা তার ডানপাশের জানালা খুলে জলপুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। হিন্দি ভাষা সাহেব বোঝে না, তাই গা করল না। জীবনে এর চেয়ে অনেক বড় বড় বিপদের কাজ সে করেছে। বিপদের মধ্যেই তার বাস।

পুলিশ অবশ্য বোটে উঠল না। ফাইবার গ্লাসের জলযন্ত্রটি আবার রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। চারধারে নিবিড় জঙ্গল। ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে ভোর-ভোর ভুতুরে আলোয় এক অপার্থিব দৃশ্য বলে মনে হয়। ক্রমে নদী চওড়া হতে লাগল। হতে হতে তার কূলকিনারা দেখা গেল না আর। সেই সঙ্গে মস্ত মস্ত ঢেউ এসে দোল দিতে লাগল স্পীডবোটটিকে।

অর্থাৎ নদী ছেড়ে তারা বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বেঁটে সাহেবের কোনো ভাবান্তর নেই। দানবটিও একমনে লঞ্চ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টা-দেড়েক পর দানবটি কম্পাস দেখে বোটের মুখ বাঁ দিকে ঘোরাল। আরো আধঘণ্টা পর কমিয়ে দিল গতি। দশ মিনিটের মাথায় কুয়াশা ভেদ করে মস্ত কালো দেয়ালের মতো দেখা দিল একটা জাহাজের শরীর। দানবটা সার্চলাইট নিভিয়ে দিল। তারপর খুব দক্ষতার সঙ্গে জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড় করাল লঞ্চটাকে। কাউকে কিছু বলতে হল না। লঞ্চ দাঁড় করানোর

এক মিনিটের মধ্যেই জাহাজের ওপর থেকে একটা মস্ত দড়ি নেমে এল। তার মাথায় আড়াআড়ি একটা লোহার ডাণ্ডা। ডাণ্ডার দুধারে দুটো হুক। দানবটা লঞ্চের মাথায় দাঁড়িয়ে হুক দুটো লঞ্চের ছাদে দুটো আংটায় পরিয়ে দিল। তারপর মসৃণ গতিতে দড়িটা লঞ্চটাকে আরোহী সমেত টেনে তুলে নিল ওপরে।

ডেকের ওপর বেশ কয়েকজন লোক। তাদের চেহারা খুবই স্বাস্থ্যবান। কালো ওভার-অল পরা। কারো মুখে কথা নেই। দুজন লোক একটা স্ট্রেচারে বাঞ্ছারামের অচেতন দেহ বহন করে নিয়ে জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে খোলের মধ্যে নেমে গেল।

আপাতদৃষ্টিতে জাহাজটা মালবাহী। তবে খোলের মধ্যে একটু জটিল গলিঘুঁজি পেরিয়ে গেলে চমৎকার কয়েকটি কেবিন আছে। আছে একটি মাঝারি ল্যাবরেটরিও।

বাঞ্ছারামের দেহটি একটি বিশেষ কেবিনে রাখা হল। গম্ভীর মুখে ডাক্তার গোছের একজন লোক এসে বাঞ্ছারামের নাড়ি আর বুক পরীক্ষা করে রক্তচাপ মাপে। সহকারীদের কয়েকটা নির্দেশ দেয়। বাঞ্ছারামের নাকে অক্সিজেনের নল ঢোকানো হয়। গোটা দুই ইনজেকশন দেওয়া হয় পর-পর।

ডাক্তার তার কাজ শেষ করে বেঁটে লোকটার দিকে চেয়ে ইংরিজিতে বলে, "কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।"

বেঁটে লোকটা ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায় বলে, "কী ঠিক হবে ? জ্ঞান ফিরে আসবে ? সে তো বাচ্চা ছেলেও বলতে পারে। ওর স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কী করতে পারো ?"

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে, "এখন কিছুই করা যাবে না। ওর বিশ্রাম দরকার।"

"কতক্ষণ ?"

"অন্তত দশবারো ঘণ্টা।"

“তারপর কী করবে ?”

“তারপর একটা ট্রুথ ইনজেকশন দেব। সেই ইনজেকশনের পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি ওর কাছ থেকে সত্যি কথাটা জেনে নিতে পারবে।”

“ওর একটু মাথা খারাপ আছে। স্মৃতিশক্তিও বোধহয় ঠিক নেই। এই অবস্থায় ট্রুথ ইনজেকশনে কি কোনো কাজ হবে ?”

“দেখা যাক।”

“ইলেকট্রিক শক দিলে কেমন হয় ?”

ডাক্তার একটু হাসে। মাথা নেড়ে বলে, “তুমি বড় বেশি তাড়াহুড়ো করছ। যদি ভাল ফল চাও তবে তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। লোকটার বয়স হয়েছে। বেশি ধকল সহ্য করতে পারবে না। মরে যেতে পারে।”

বেঁটে লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলে, “মরলে আমাদের ক্ষতি নেই। শুধু মরার আগে আমরা কিছু তথ্য বের করে নিতে চাই।”

ডাক্তার ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, “ঠিক আছে। আমি যথাসাধ্য করব। তবে মনে রেখো তুমি একটু বেশি ঝুঁকি নিচ্ছ।”

বেঁটে লোকটা নিরুত্তাপ গলায় বলে, “শেষ অবধি তো ওকে মেরে ফেলতেই হবে।”

ডাক্তার আর কিছু বলল না।

বেলা দশটা নাগাদ বাঞ্ছারাম চোখ মেললেন। তাঁর সর্বাঙ্গে ব্যথা। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। চারদিকে চেয়ে কিছু চিনতে পারলেন না। শুধু অস্ফুট গলায় বললেন, “দিদি, রসগোল্লা খাব।”

সাদা পোশাক পরা একজন লোক এগিয়ে এল সিরিঞ্জ হাতে। বাঞ্ছারাম ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে নিতে গেলেন। পারলেন না। হাত-পা সব স্ট্র্যাপ দিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা। ইনজেকশনটায় বেশ

ব্যথা পেলেন বাঞ্ছারাম। "উঃ" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। চোখে জল এসে গেল। নাকের মধ্যে একটা নল পরানো। ঝাঁঝালো অক্সিজেন বুকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। নাক জ্বালা করছে। বাঞ্ছারাম ছটফট করতে লাগলেন। হাত-পায়ের বাঁধন খোলার জন্য টানাহ্যাঁচড়া করতে লাগলেন।

হঠাৎ সামনে দেখেন, সেই দানবটা দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে হাত, দু চোখে নিষ্ঠুর হিংস্র চাউনি। বাঞ্ছারাম ভয়ে আর নড়লেন না। লোকটা হিন্দিতে বলল, "বেশি নড়াচড়া কোরো না। তোমার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা আছে। নড়লে জখম হবে। তাছাড়া পরশুর মারের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।"

"আমি কোথায় ?"

"ভাল জায়গায় আছ। একটা জাহাজে। মাঝ-দরিয়ায়। চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ শুনতে পাবে না। অতএব চুপ করে লক্ষ্মীছেলের মতো শুয়ে থাকো।"

বাঞ্ছারাম শুয়ে রইলেন। বোজা চোখের কোল ভরে উঠল চোখের জলে। একটু ফুঁপিয়ে উঠলেন।

বিকেল না সকাল, আলো না অন্ধকার তা বোঝবার উপায় নেই। কেবিনের জানালা বন্ধ, দরজা বন্ধ। ঘরে সারাক্ষণ একটা মৃদু বাতি জ্বলছে। বাঞ্ছারাম কয়েকবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার জাগলেন। আবার ঘুমোলেন।

বহুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর বেঁটে লোকটাকে হঠাৎ দেখতে পেলেন বিছানার পাশে। সঙ্গে ডাক্তার।

বেঁটে লোকটা তেমনি শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেমন বোধ করছ ?"

বাঞ্ছারাম হাঁ করে চেয়ে রইলেন। মুখে কথা এল না।

বেঁটে লোকটার কথায় ধমক-চমক নেই, কিন্তু এমন একটা



ঠাণ্ডা নিষ্ঠুরতা আছে যা হৃৎপিণ্ডকে থামিয়ে দিতে চায়। অথচ লোকটা পুতুলের মতো ছোটখাটো। যে-কেউ ওকে এক হাতে মাটি থেকে তুলে নিতে পারে। কিন্তু ওর চোখের দিকে চাইলে বা ওর ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরটি শুনলে কারোরই আর ওকে ঘাঁটাতে সাহস হবে না। লোকটা বাঞ্ছারামের দিকে অনেকক্ষণ পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বলল, "কিছু মনে কোরো না, পৃথিবীর স্বার্থে তোমাকে কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। আমরা তোমার ওপর কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট করব। তাতে তোমার মৃত্যু অবধি ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের অন্য উপায়ও নেই।"

বাঞ্ছারাম ডুকরে উঠে বললেন, "আমি দিদির কাছে যাব।"

বেঁটে লোকটা হাসল। বলল, "পুরুষ মানুষের মতো আচরণ করো। তোমরা ভারতীয়রা এত কাপুরুষ কেন?"

"আমাকে মেরো না।"

"মারতে চাইছি না। তোমার চিকিৎসাই করতে চাইছি। কিন্তু কাজটা একটু বিপজ্জনক। তাতে তোমার মৃত্যু ঘটতে পারে। আর যদি ঘটেই তবে তা বীরের মতো মেনে নিও।"

"আমি রসগোল্লা খাব। মরতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না।"

বেঁটে লোকটা ডাক্তারের দিকে চাইল। বলল, "এবার ট্রুথ ইনজেকশনটা দাও। আমার মনে হচ্ছে ওর পাগলাটে মনের কোনো লুকনো ঘরে সেই স্মৃতি আজও আছে। একটু দাঁড়াও। দেখি ও রাব্বিকে চিনতে পারে কি না।"

লোকটা একটা বোতাম টিপল। একটা লোক হাজির হতে তাকে মৃদুস্বরে কী নির্দেশ দিল।

একটু বাদেই চারজন লোক একজন বুড়োমানুষকে টেনে নিয়ে এল ঘরে। তার চুল সাদা এবং কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। শরীর রোগা।

চোখে জুলজুলে চাউনি। তাকে বাঞ্ছারামের সামনে দাঁড় করানো হলে বেঁটে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "একে চিনতে পারো ?"

"না।"

"এ হল রবিন ফরডাইক। হিট অ্যামপ্লিফিকেশনের কাজে এ তোমাকে সাহায্য করত। তারপর তোমার কাগজপত্র চুরি করে নিয়ে পালায়। যাওয়ার আগে ওষুধ দিয়ে তোমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে দিয়ে যায়। এর ইচ্ছে ছিল, হিট অ্যামপ্লিফায়ার তৈরি করে দুনিয়া জুড়ে ব্যবসা করবে। আমরা ওকে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়েছিলাম এই আশায় যে, ও তাপ-পরিবর্ধক তৈরি করে আমাদের এজেন্সি দেবে। আমাদের মতো আরো কয়েক হাজার লোককে ঠকিয়ে ও এখন বহু টাকার মালিক। কিন্তু ও জানত না, পৃথিবীর সব জায়গায় আমাদের হাত গিয়ে পৌঁছোয়। কী, চিনতে পারছ ?"

বাঞ্ছারাম চেয়ে থাকেন। স্মৃতি টলমল করে। কুয়াশা যেন একটু কেটে যায়। রবিন ফরডাইক ! এ যেন পূর্বজন্মে শোনা একটা নাম।

ফিসফিস করে বাঞ্ছারাম বললেন, "রবিন ! রবিন ! এত বুড়ো হয়ে গেছ ?"

রবিন কিছু বলল না। বলার মতো অবস্থাও নয়। বেঁটে লোকটা তার হয়ে জবাব দিল, "না, বুড়ো হয়নি। তবে ওকে আমরা পাকিয়ে বুড়ো করেছি। শোনো বাঙালি বৈজ্ঞানিক, তোমার অবস্থা রবিনের চেয়েও খারাপ হতে পারে। এখনো মনে করার চেষ্টা করো, সেই ফরমুলাটা কোথায় আছে। রবিন জানে, তুমি শেষ পর্যন্ত হিট অ্যামপ্লিফায়ার তৈরি করার পদ্ধতি বের করেছিলে। কিন্তু ফরমুলাটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। আমরা জানতে চাই, কোথায়।"

বাঞ্ছারাম নিজেও তা ভুলে গেছেন। প্রাণপণে চোখ বুঝে মনে করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

বেঁটে লোকটা ডাক্তারের দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বলল, "এবার ট্রুথ ইনজেকশন দাও।"

বিনা বাক্যে ডাক্তার একটা সিরিঞ্জ ভরে নিয়ে এগিয়ে আসে।

ইনজেকশন দেওয়ার পর কিছুক্ষণ অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় ছটফট করলেন বাঞ্ছারাম। তারপর আস্তে-আস্তে স্থির হয়ে গেলেন। চোখদুটি বিস্ফারিত। মুখ ফ্যাকাসে। ঠোঁটের কোণে ফেনা। অল্প-অল্প হাঁফাচ্ছেন।

মিনিট দশেক পরে বেঁটে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "বলো ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, তুমি কি সত্যিই পাগল ?"

বাঞ্ছারাম শান্ত স্বরে চোস্ত ইংরিজিতে বললেন, "না। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। মাঝে-মাঝে আমি বয়স হারিয়ে ফেলি। বার্ধক্যের সঙ্গে শৈশব গুলিয়ে যায়। কিন্তু সেটা মস্তিষ্কের কোনো জটিল অসুখ নয়।"

"এখন তোমার স্মৃতিশক্তি কেমন কাজ করছে ? দশ-বারো বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে ?"

"পড়ছে। আমি তখন হিট অ্যামপ্লিফিকেশন নিয়ে গবেষণা করতাম। রবিন ফরডাইক আমাকে সাহায্য করত। অবশেষে একদিন আমি সাফল্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। আমি জানতাম আমার আবিষ্কার অত্যন্ত মূল্যবান। এও জানতাম, আমার আবিষ্কার আমার সহকারি রাব্বি না রবিন যথেষ্ট বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। শেষ দিকে আমি তাই দু'রকম লগবুক লিখতে লাগলাম। আমার আসল গবেষণার রিপোর্ট আমি মাইক্রোফিল্মে তুলে কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলতাম। ল্যাবরেটরিতে রাখতাম একটা ভুয়ো রিপোর্ট। কিন্তু বুদ্ধিমান রবিন

তবু টের পেয়েছিল যে, আমি সাফল্যের দরজায় পৌঁছেছি। তাই সে একদিন আমার গবেষণাগারের কুঁজোর জলে ওষুধ মেশায়। সেটা খেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমার স্মৃতিশক্তি ও স্বাভাবিক চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়।"

বেঁটে লোকটা অধৈর্য হয়ে বলে, "সে-কথা থাক। এখন বলো, সেই মাইক্রোফিল্মটি কোথায় আছে।"

"ফিল্ম আছে একটা প্ল্যাস্টিকের মোড়কে। আমি সেটা একটা রসগোল্লার হাঁড়িতে রেখেছিলাম।"

বেঁটে লোকটা দানবটাকে জিজ্ঞেস করল, "রসগোল্লার মানে কী ?"

দানবটা বুঝিয়ে বলল। বেঁটে লোকটা ভ্রূ কঁচকে বলল, "ওরকম মূল্যবান জিনিস একটা মাটির পাত্রে রাখা কি নিরাপদ ছিল ?"

"না। অন্তত দশ-বারো বছরের মতো লম্বা সময়ের পক্ষে তো নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তখন তো আমি জানতাম না যে, আমি একরকম অকেজো হয়ে যাব।"

"সেই হাঁড়িটা এখন কোথায় আছে ?"

"ঠিক জানি না। তবে সেই হাঁড়িতে মাটি ভরে আমি তাতে একটা ক্যাকটাস লাগিয়েছিলাম। আমাদের ভিতরের বারান্দায় সেটা রাখা ছিল।"

"এখনো সেখানেই আছে ?"

"কী করে বলব ? আমি তো হাঁড়িটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই এখন মনে পড়ল।"

"তুমি সেই হাঁড়িটা কি সম্প্রতি লক্ষ করেছ ?"

"না। তবে সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে মাইক্রোফিল্ম বের করেও কারো কোনো লাভ হবে না। আমি আমার রিপোর্ট নিজস্ব

সাংকেতিক ভাষায় লিখেছি। সেই রহস্য আমি ছাড়া আর কারো পক্ষেই ভেদ করা সম্ভব নয়।"

বেঁটে লোকটা হাসল। বলল, "তাই হবে, বৈজ্ঞানিক। আমরা তোমার মাইক্রোফিল্ম এনে দেব। তারপর তুমিই সেই সংকেত উদ্ধার করবে।"

"তারপর কী হবে? তোমরা ভাল লোক নও। আমি সংকেত ভেঙে দেওয়ার পর তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে জীবিত রাখবে না!"

বেঁটে লোকটা চোখের ইশারা করে। ডাক্তার বাঞ্ছারামকে আর-একটা ইনজেকশন দেয়। বাঞ্ছারাম ঘুমিয়ে পড়েন।



জন সব কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর মাথা নেড়ে ম্লান হেসে বলল, "আমি যাদের সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছিলাম এরা বোধহয় তারাই।"

রতন উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করে, "কারা?"

জন বলল, "এরা সি-আই-এ বা কে-জি-বি নয়। এরা কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের লোকও নয়। তবে এদের ঘাঁটি অ্যামেরিকায়। পৃথিবীর কয়েকজন কুখ্যাত ধনী ব্যক্তির এক দুষ্টচক্র। রাব্বি এদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে খেতে গিয়েছিল। তারপর একদিন সে হাপিস হয়ে যায়। এই দুষ্টচক্রের ক্ষমতা অসীম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গুণ্ডা সংগঠন মাফিয়া এদের হাতের মুঠোয়। এদের এত টাকার জোর, যার বলে এরা যে-কোনো রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র

অচল করে দিতে পারে, যে-কোনো পুলিশবাহিনীকে রাতারাতি কিনে নিতে পারে। হিট অ্যামপ্লিফায়ারের ফরমুলা হাতে পেলে তার আন্তর্জাতিক পেটেন্ট কিনে নেবে। তারপর শুরু করবে একচেটিয়া ব্যবসা। আরো একটা ভয় আছে। হিট অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রটা তো শুধু মানুষের উপকারই করবে না। তাই দিয়ে মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করাও সম্ভব।"

রতন আচমকা বলল, "কিন্তু তোমরাও তো যন্ত্রটা হাত করতে চাইছ। তোমরাই বা এটা নিয়ে কী করবে?"

জন বলে, "আমাদের কুমতলব নেই। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি তৃতীয় বিশ্বের লোক। আমার দল গরিব দেশগুলির বন্ধু। আমরা সন্ত্রাসবাদী বটে, কিন্তু আমাদের লড়াই ধনী ও ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে। ওরা আমাদের ঘৃণা করে, মানুষ বলে মনেও করে না। সেই তৃতীয় বিশ্বের একজন বৈজ্ঞানিকের এই মহামূল্যবান আবিষ্কারকে আমি বা আমরা বেহাত হতে দিতে চাই না। এই যন্ত্র একদিন তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে শক্তিশালী দেশগুলির সম্পদ ও ক্ষমতার পার্থক্য ঘুচিয়ে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাই আমি চেয়েছিলাম ফরমুলাটা আমাদের হাতে থাক।"

রতন উদ্বেগের সঙ্গে বলে, "কিন্তু আমার বাবার কী হবে?"

জন চিন্তিত স্বরে বলে, "যদি ওরা ইতিমধ্যে ফরমুলাটা হাতে না পেয়ে থাকে তবে তোমার বাবাকে ওরা মারবে না। কাজেই আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।"

"আমার বাবাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে জানো?"

"আন্দাজ করতে পারি। বঙ্গোপসাগরে একটা গ্রীক জাহাজ নোঙর ফেলে আছে। জাহাজটার নাম এম এস ফেবুলাস। মস্ত জাহাজ। সম্ভবত তাতে।"

"আমরা কি সেই জাহাজটার কথা পুলিশকে জানাব ?"

জন বলে, "তুমি বোকা। কোনো পুলিশ বা আর কারো সাধ্যি নেই কিছু করার। তাছাড়া পুলিশের এক্তিয়ারও অতদূর নয়। ধৈর্য ধরো। আমার ক্ষীণ আশা, ওরা ফরমুলাটা এখনো পায়নি। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে ওরা আবার এখানে হানা দিতে আসবে। তখন আমরা ওদের পিছু নেব।"

"ওরা কতজন ?"

জন হাসল। "ওরা সংখ্যায় অনেক। তবে জাহাজের মাঝি মাল্লা সবাই মাফিয়া নয়। তারা বোধহয় জানেও না, জাহাজটার খোলের অসংখ্য কেবিনে কী কাণ্ড হচ্ছে। তবু বলি, সংখ্যায় ওরা কম নয়, দুর্বল তো নয়ই। ওদের মেলা বন্দুক পিস্তল আছে। আমাদের সম্বল তোমার আর রোলোর ঘুষির জোর। আমার কাছে একটা ছোট্ট সাব-মেশিনগান মাত্র আছে। কিন্তু ওদের অস্ত্রবলের সামনে সেটা নস্যি। কাজেই গায়ের জোরে কাজ হবে না। বুদ্ধির জোরই আসল। শোনো রতন, আমি আর রোলো আপাতত এখানেই আস্তানা নিচ্ছি। আমাদের সাদা চামড়া খুবই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু আমাদের কাছে কৃত্রিম গায়ের রং আছে। বিদেশে মেয়েরা গায়ের চামড়া ট্যান করার জন্যে এই রং মাখে। আমি আর রোলো সেই রং মেখে ইণ্ডিয়ান হওয়ার চেষ্টা করব। তুমি শুধু আমাদের দুটো পাজামা আর পাঞ্জাবি যোগাড় করে দাও।"

রতন মাথা নেড়ে ভিতরবাড়িতে গিয়ে পাজামা আর পাঞ্জাবি নিয়ে এসে যখন ফের ল্যাবরেটরিতে ঢুকল, তখন জন আর রোলো প্রায় ভারতীয় সেজে বসে আছে। দুজনেরই চোখে গগ্‌লস। পাজামা পাঞ্জাবি পরার পর দুজনেই খাঁটি ভারতীয় বনে গেল। চুলগুলিও ইতিমধ্যে কলপ লাগিয়ে কালো করে নিয়েছে।

ভোর হয়ে এসেছে। জন বলল, "রতন, ওরা আজ যে-কোনো সময়ে এসে হাজির হবে। চারদিকে লক্ষ রেখো। ওরা এলে বাধা দিও না। আমার মনে হয়, ওরা আসবে আজ গভীর রাতে। তুমি দিনের বেলা যতটা পারো, ঘুমিয়ে নাও। আমি আর রোলো বেরোচ্ছি। কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। দুপুরের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।"

রতন অবশ্য ঘুমোল না। ঘুমোনোর মতো মনের অবস্থা নয়। বাবার জন্য উদ্বেগ আর তীব্র উত্তেজনায় সে অস্থির। জন আর রোলো চলে যাওয়ার পর সে খুব সাবধানে সারা বাড়ি সার্চ করল। কোথাও কিছু পেল না। তবে বাবার ঘরের স্টীলের আলমারিতে সে বাবার কয়েকটা পুরনো ডায়েরি খুঁজে পেল। বেশির ভাগ ডায়েরিতেই কোনো রোজনামচা নেই, কেবল কিছু বৈজ্ঞানিক আঁক কষা আছে। তবে একটা ডায়েরিতে সে কিছু বাংলা লেখা খুঁজে পেল। এগারো বছর আগেকার এক ডিসেম্বর মাসে বাবা লিখেছেন : জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না! রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই কথাটুকুর পাশে ব্র্যাকেটে লেখা : "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে? যেখানে দেখহ ছাই উড়াইয়া দেখ তাই মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।"

এসব হেঁয়ালির কোনো মাথামুণ্ডু বুঝল না রতন। সে গিয়ে তার বুড়ি পিসিকে জিজ্ঞেস করল, "পিসি, বাবা কোনো জিনিস লুকোতে হলে কোথায় লুকোতে পারে বলো তো?"

পিসি ভাইয়ের জন্য কেঁদেকেটে শয্যা নিয়েছে। বলল, "কী জানি বাছা। কী লুকোবে বল্ তো?"

"দশ-বারো বছর আগে বাবা একটার ফরমুলা লুকিয়ে রেখে তারপর সে-কথা ভুলে যায়।"

পিসি অনেক ভেবেচিন্তে বলে, "সে তো অনেকদিন হয়ে

গেছে।”

“তুমি তো বাবার সব কিছু জানো, আর এটা মনে করতে পারছ না ?”

পিসি বলল, “কিছু কিছু মনে আছে। বাঞ্চা তখন একটা ভারী ক্যামেরা দিয়ে কাগজপত্রের ছবি তুলত। রাত জেগে জেগে রোজ ঐসব করত বলে কত বকেছি। তারপর সেইসব কাগজপত্র আগুনে পুড়িয়ে দিত। ঘর নোংরা হত।”



উত্তেজিত হয়ে রতন বলে, "সেই ক্যামেরাটা কোথায় ?"

"কবে বিক্রি হয়ে গেছে।"

"আর ফোটোগুলো ?"

"সে তো বাঞ্ছার পাগলামি। জন্মে শুনিনি বাবা কেউ কাগজের ফোটো তোলে।"

"আর কিছু করতে দেখোনি বাবাকে ?"

"তা দেখব না কেন ? কোনোদিন তার গাছপালার শখ ছিল



না। পাগল হওয়ার আগে হঠাৎ তার টবে গাছ করার বাই চাপল। হাঁড়িকুড়ি যা পেত, তাতেই মাটি ভরে গাছপালা লাগাত। তার জন্যেও আমার কাছে বকুনি খেয়েছে।"

"গাছ ? কিসের গাছ ?"

"কত রকমের। সবই আগাছা।"

রতন খুব হতাশ হল। সে জানে, জনের কথামতো যদি সত্যিই মাফিয়ারা ফরমুলার সন্ধানে আসে আর যদি সেটা সহজে খুঁজে না পায় তাহলে বাড়ির কাউকে ছেড়ে দেবে না। পুলিশকে খবর দিয়ে লাভ নেই। পুলিশ আজ তাদের রক্ষা করলেও রোজ তা পারবে না। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই ফরমুলাটা খুঁজে পাওয়া দরকার।

রতন জিজ্ঞেস করে, "পিসি, সেই গাছের টবগুলো কোথায় আছে জানো ?"

"সে-সব কবে ফেলে দিয়েছি।"

"কোথায় ফেলেছে মনে আছে ?"

"পিছনে জঙ্গুলে জমিটায়। কেন, সেগুলো দিয়ে এখন কী করবি ?"

"কাজ আছে।" বলে রতন উঠে গেল।

বাড়ির পিছন দিকে অনেকটা জমি তাদের। এক সময়ে সব্জির বাগান ছিল। এখন অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে। বুক-সমান উঁচু আগাছা। সাপখোপ সবই থাকতে পারে। রতন একটা ভোজালি দিয়ে গাছপালা সাফ করতে লাগল। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা পরিশ্রমের পর অবশেষে একদম বাগানের শেষ প্রান্তে দেওয়াল ঘেঁষে গোটা দশেক ভাঙা হাঁড়ি আর টব দেখতে পেল সে। গাছগুলো কবে মরে গেছে। শুধু একটা ক্যাকটাস আজও ধুকধুক করে বেঁচে আছে কোনোক্রমে।

"কাঁটা হেরি" কথাটা ঝট করে মনে পড়ে গেল রতনের। সে হাঁড়ি থেকে ক্যাকটাস গাছটাকে টেনে বের করে আনল। হাঁড়িটা ভেঙে গেল, আর ক্যাকটাসের সঙ্গে গোল মাটির চাপড়া উঠে এল। সেই মাটির ডেলার সঙ্গে সবুজ রঙের একটা প্লাস্টিকের মোড়ক।

কাঁপা হাতে মোড়ক খুলে রতন দেখে, তার মধ্যে খুব ছোট্ট একটা নেগেটিভ ফিল্মের টুকরো। সযত্নে পার্চমেন্ট কাগজে মোড়া।

আর-একটা হাঁড়ি যোগাড় করে তাতে সেই প্ল্যাস্টিকের মোড়ক সমেত ক্যাকটাসটাকে লাগিয়ে ভিতরের বারান্দায় রেখে দিল রতন। খানিকটা নিশ্চিন্ত। তারপর দরদালানে ঘুষি মারা বস্তায় অনেকক্ষণ ধরে ঘুষি চালিয়ে শরীর গরম করে নিল। সব অবস্থার জন্যই নিজেকে তৈরি রাখা দরকার।

জন আর রোলো ফিরল দুপুর গড়িয়ে। তারা একটা গাড়ি সঙ্গে করে এনেছে।

জন বলল, "সম্ভবত আমাদের সমুদ্রযাত্রা করতে হবে। অবশ্য যদি ডগলাসের লোকেরা এ-বাড়িতে হানা দেয়। তা না হলে আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না। ধরে নিতে হবে যে, ওরা ফরমুলা পেয়ে গেছে এবং তোমার বাবাকেও মেরে ফেলেছে।"

রতন বলল, "ওরা ফরমুলা পায়নি।"

"কী করে জানলে?"

রতন কিছুই গোপন করল না। জন সব শুনে বলল, "রতন, বক্সাররা একটু নির্বোধ হয়। আমরা বলি পাঞ্চ-ড্রাঙ্ক। ঘুষি খেয়ে খেয়ে তাদের ব্রেন সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তুমি খুবই বুদ্ধিমান।"

রতন একটু হাসল মাত্র।

সন্ধের পর জন ও রোলো আশ্রয় নিল গবেষণাগারে। রতন তার ঘরের জানালা ফাঁক করে বসে রইল। ক্রমে সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি হল। রাত্রি নিশুত হতে চলল। জানালার ফাঁক দিয়ে রতন ভেতরের বারান্দাটা দেখতে পাচ্ছিল। হাঁড়ির ক্যাকটাস গাছটাও।

থানার ঘড়িতে রাত দুটো বাজার ঘণ্টি পড়ল। নিশুতি নিঃঝুম রাত চিরে একটা কুকুর ভুক-ভুক করে উঠল কাছেপিঠে। একটা বেড়াল ডাকল।

চেয়ে থাকতে থাকতে রতনের চোখ টনটন করছিল। হাই উঠছিল বার বার। এক সময়ে সে হয়তো ঘুমে একটু ঢুলেও পড়েছিল। হঠাৎ টানটান হয়ে বসে সে তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক নজর করতে লাগল। কোনো শব্দ হয়নি। অস্বাভাবিক কিছু ঘটেওনি। কিন্তু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে একটা বিপদের গন্ধ ধরা পড়েছে।

অল্প জ্যোৎস্না আছে আকাশে। তারই আবছা আলোয় সে দেখতে পেল, কালো পোশাক পরা দুই মূর্তি নিঃশব্দে উঠোনের পাঁচিলে উঠে দাঁড়াল। তারপর শব্দহীন লাফে নেমে এল ভিতরে। চকিত এবং নিঃশব্দ তাদের গতিবিধি। চোখের পলকে তারা ক্যাকটাস গাছটাকে তুলে ফেলল হাঁড়ি থেকে। কয়েক মুহূর্তে বের করে ফেলল সেই মোড়ক। আবার নিঃশব্দে দেওয়াল টপকে চলে গেল।

রতন দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই তার কাঁধে হাত রাখল জন। মৃদু স্বরে বলল, "তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওরা যাবে ক্যানিং। আমি জানি। তুমি তৈরি তো?"

"হ্যাঁ।"

"চলো।"

দুজন চোরের মতোই দেয়াল ডিঙিয়ে তারা পিছনের পোড়ো

জমিটায় নামল। বাগানের বাইরে জনের গাড়ি দাঁড় করানো। স্টীয়ারিং হুইল ধরে রোলো বসে আছে। তারা উঠতেই গাড়ি বিদ্যুৎবেগে নিশুত রাতের ফাঁকা রাস্তা ধরে দৌড়োতে লাগল।

রতন জিজ্ঞেস করল, "আমরা কী করব ?"

জন বলে, "আমাদের লোকসংখ্যা মাত্র তিনজন। মুখোমুখি আমরা পারব না। তবে আমি একটা স্পীডবোটের ব্যবস্থা করেছি। জাহাজটা কোথায় আছে তারও খোঁজ নিয়েছি। আমরা জাহাজটার কাছাকাছি পৌঁছে মোটরবোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেব। তারপর বেতার সংকেতে একটা এস ও এস পাঠাব ওই জাহাজে। বলব যে, আমরা বিপন্ন, আমাদের উদ্ধার করো।"

"ওরা তা করবে ?"

জন মৃদু হেসে বলল, "করবে। দুটো কারণে। আমরা সন্দেহজনক লোক কিনা তা জানার জন্য। দ্বিতীয়ত, ওই জাহাজের সবাই মাফিয়া নয়।"

"কিন্তু তারপর ?"

"তারপর দেখা যাবে। আগে তো জাহাজে উঠি।"

"তুমি মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছ জন।"

"ঝুঁকি নেওয়াই আমার অভ্যাস।"

রতন আর কথা বলল না।

তারা যখন ক্যানিং পৌঁছল তখনো রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। সরু রাস্তা বেয়ে কুয়াশার মধ্যে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জন আর রোলোর পিছু-পিছু একটা আঘাটায় নেমে চমৎকার ছোট্ট একটা স্পীডবোটে উঠল রতন। উঠতে না উঠতেই বোট ছেড়ে দিল রোলো।

কোথায় যাচ্ছে, রতন জানে না। কিন্তু জন বা রোলোর কোনো ভাবান্তর নেই। রোলো বোট চালাচ্ছে আর জন একটা

ম্যাপ আর কম্পাস নিয়ে বসে আছে। কারো মুখে কথা নেই।

ভোর-ভোর একটা আভা যখন আকাশে ফুটে উঠেছে, তখন জন একটা অদ্ভুত ধরনের দূরবিন তুলে চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল। কী দেখল সে-ই জানে। মৃদু স্বরে বলল, "স্পীড কমাও, এস ও এস পাঠাতে থাকো।"

রতন তার চারধারে সমুদ্রের বিপুল কালো জলরাশি দেখতে থাকে। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে যাওয়ার আশা তাদের খুবই কম। তবু এখন এখন নিজের চেয়ে তার বাবার কথাই বেশি ভাবছে রতন। ভাবছে বুড়ি পিসিটার কথাও। সে আর তার বাবা যদি এদের হাতে খুন হয়, তবে পিসিকে দেখার কেউ থাকবে না।

জন হঠাৎ দূরবিনটা রতনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "দ্যাখো, আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি।"

রতন দূরবিনটা চোখে লাগাল। আশ্চর্য দূরবিন। কুয়াশা এবং অন্ধকার ভেদ করে অনেক দূর পর্যন্ত তা দিয়ে দেখা যায়। সে দক্ষিণ দিকে অনেকটা দূরে প্রকাণ্ড কালো জাহাজটাকে দেখতে পেল। রতন জিজ্ঞেস করে, "এটা কী রকম দূরবিন জন?"

"ইনফ্রা রেড দূরবিন। শোনো, একটু বাদেই আমাদের এস ও এস জাহাজে পৌঁছবে। সম্ভবত ওরা জল থেকে তুলেও নেবে আমাদের। তারপরই শুরু হবে খেল। মাথা ঠাণ্ডা রেখো। বন্দুক পিস্তল দেখে ঘাবড়ে যেও না। আমার কাছে যে সাব-মেশিনগান আছে তা সঙ্গে নেওয়ার উপায় নেই। কারণ ওরা আমাদের জাহাজে তুলেই সম্ভবত সার্চ করবে। সাব-মেশিনগান সঙ্গে থাকলে ওরা সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের জলে ফেলে দেবে। সুতরাং নিরীহ ভাল মানুষের মতো নিরস্ত্র অবস্থায় আমরা শত্রুপুরীতে ঢুকছি। অস্ত্রের বিরুদ্ধে, সংঘবদ্ধ হিংস্রতার বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র সম্বল বুদ্ধি আর ঠাণ্ডা মাথা। মনে রেখো।"

ইঞ্জিন বন্ধ করে ধীরে-ধীরে ঢেউয়ে দোল খেয়ে-খেয়ে স্পীডবোট জাহাজের দিকে এগোতে লাগল। যত এগোয়, তত বুক দুরদুর করে রতনের। অস্থির বোধ করে সে। কিন্তু জন আর রোলোর ভাবান্তর নেই। আজ পর্যন্ত রোলোকে একটিও কথা বলতে শোনেনি রতন। অথচ ওকে বোবা বলেও মনে হয় না।

জাহাজটা যে কত বড়, কাছাকাছি এসে তার খানিকটা আন্দাজ পেল রতন। একটা মস্ত দুর্গও তার মধ্যে এঁটে যায়। এম এস ফেবুলাস সত্যিই ফেবুলাস।

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল, ওপরের ডেকে কয়েকজন লোক সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে আসতেই ওপর থেকে একটা দড়ির মই নেমে এল। রোলো স্পীডবোটের ছাদে উঠে মইটাকে ধরল, তারপর প্রথমে জন আর পিছনে রতন আস্তে-আস্তে মই বেয়ে উঠতে লাগল। তার পিছনে রোলো। সমুদ্রে হাওয়া নেই, তবু মইটা দোল খাচ্ছে। আর কত ওপরে যে উঠে যাচ্ছে তারা! দশতলা বাড়ির চেয়েও উঁচু বুঝি জাহাজটা!

ডেকের কাছাকাছি পৌঁছতেই শক্ত বলবান কয়েকটা হাত তাদের টেনে তুলে নিল ওপরে।

জন হাঁফাচ্ছিল। কিন্তু কঠিন পরিশ্রমে অভ্যাস আছে বলে রতন বা রোলোর হাঁফ ধরেনি। কিন্তু গায়ে মোটা পুলওভার থাকা সত্ত্বেও শীতে কাঁপছিল রতন। জন এবং রোলো শীতের দেশের লোক। পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর দুজনেরই জহর কোট মাত্র পরা। তবু তাদের শীত লাগছিল না।

ডেকের ওপর কর্কশ এবং শক্তসমর্থ চেহারার কয়েকজন নাবিক দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই বিদেশী। তাদের মধ্যে একটু লম্বাচওড়া চেহারার একজন বোধহয় একটু উচ্চপদস্থ। সে জন-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের বিপদটা কী ধরনের?"

জন বলল, "আমাদের মোটরবোটের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। সারানোর যন্ত্রপাতি সঙ্গে নেই। আমরা সাহায্য চাই।"

মোড়ল গোছের লোকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, "তুমি যা বলছ তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। টুল বক্স ছাড়া কোনো বোকাও সমুদ্রে বেরোয় না।"

"আমরা ভুলে টুল বক্স ফেলে এসেছি।"

লোকটা তেমনই তিক্ত স্বরে বলে, "ঠিক আছে, আমাদের একজন মেকানিক গিয়ে তোমাদের যন্ত্র পরীক্ষা করবে। তোমরা ভিতরে যাও। যদি কোনো চালাকি করতে এসে থাকো, তাহলে মুশকিল হবে।"

জন দৃঢ়স্বরে বলে, "আমাদের কোনো খারাপ মতলব নেই।"

"দেখা যাবে। এখন হাত তুলে দাঁড়াও। আমরা তোমাদের সার্চ করব।"

জন বিস্ময়ের ভান করে বলে, "সার্চ করবে ? কেন, আমরা কি ডাকাত ?"

"কে জানে ! আমরা ঝুঁকি নিতে চাই না। হাত তোলো।"

অগত্যা তিনজনই হাত তোলে। তিনটে লোক তাদের সার্চ করে। কিছুই পাওয়া যায় না অবশ্য।

মোড়ল লোকটা ভ্রূ কুঁচকে দেখছিল। সার্চ হয়ে গেলে অবহেলার গলায় বলে, "এদের সিক বে-তে নিয়ে যাও। ফরোয়ার্ড ডেকে।"

জন চারেক হোঁতকা নাবিক তাদের প্রায় ঘিরে ধরে নিয়ে চলল। অনেকটা পথ। লোহার সিঁড়ি দিয়ে দুইতলা নামতে হল। একতলা ফের উঠতে হল। অনেক গলিঘুজি পেরোতে হল। অবশেষে তারা পৌঁছল জাহাজের সামনের দিকে খোলের মধ্যে একটা জনহীন জায়গায়। একজন সাদা পোশাক পরা লোক



এসে চাবি দিয়ে একটা দরজা খুলল। তিনজন ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

রতন দেখে, তারা লম্বাটে একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকগুলো লোহার খাট সার বাঁধা। সেগুলোর পায়া মেঝের কাঠের তক্তায় নাট বল্টু দিয়ে আঁটা, যাতে জাহাজের দুলুনিতে সরে না যেতে পারে। ঘরটার মধ্যে বীজাণুনাশকের গন্ধ, যেমন গন্ধ হাসপাতালে পাওয়া যায়। দেয়ালে সারি-সারি কাবার্ড।

জন একটা খাটে বসে হাঁফ ছেড়ে বলে, "ও গড।"

রতন এরকম পরিস্থিতিতে আগে কখনো পড়েনি। কিন্তু জন ও রোলোর মুখে নিরুদ্বেগ ভাব দেখে সে বুঝতে পারে, এরকম বিপদ ওদের নিত্যকার সাথী। সে বলল, "এখন আমরা কী করব?"

জন মাথা নেড়ে বলে, "কিছু নয়। নৌকো সার্চ করে ওরা ফিরে আসুক। তারপর যা করার ওরাই করবে।"

"কী করবে?"

জন এ কথার জবাবে মৃদু হাসল শুধু। তারপর বলল, "ভয় নেই, সার্চ করে ওরা কিছুই পাবে না। আমাদের ইঞ্জিনও যথার্থই খারাপ। রোলো ইঞ্জিন খারাপ করার ওস্তাদ। সুতরাং এক্ষুনি আমাদের বিপদ নেই।"

তিনজন চুপচাপ বসে রইল।

অন্তত ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ পাওয়া গেল। ভিতরে এসে দাঁড়াল লম্বা-চওড়া লোকটা। সঙ্গে বিশাল আকৃতির এক দানব। দানবটা বিদেশী নয়। সম্ভবত ভারতীয়। তার চোখমুখ অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং খুনের মতো শীতল।

মোড়ল লোকটা বলল, "তোমাদের ইঞ্জিনের স্পার্ক প্লাগ

খারাপ। কিন্তু আমাদের কাছে ওই মাপের প্লাগ নেই। দুঃখিত।"

বলে তাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল লোকটা। তারপর মৃদু হেসে জনকে বলল, "তোমাদের দুজনের চোখের গগ্‌লসটা একটু রহস্যজনক। তোমাদের কি কনজাংটিভাইটিস হয়েছে?"

"হ্যাঁ।" জন বলল।

"রোগটা ছোঁয়াচে। আরো ছোঁয়াচে হল সন্দেহবাতিক।"

জন একটু ফুঁসে উঠে বলে, "তার মানে?"

লোকটা মৃদু হাসিমুখেই বলে, "আমার এই বন্ধুটি ভারতীয়। সে জানতে চাইছে তোমরা ভারতের কোন্ অঞ্চলের লোক।"

রতন এই সময়ে এক পা এগিয়ে গিয়ে বলে, "আমরা বাঙালি।"

"তোমার গগ্‌লস পরা বন্ধুরাও বাঙালি?"

একটু দ্বিধার গলায় রতন বলে, "হ্যাঁ।"

"আমার এই বন্ধু বাংলা জানে। তোমার বন্ধুদের একটু বাংলায় কথা বলতে বলো।"

জন চুপ করে বসে রইল। রতনও কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। সন্দেহ যখন করেছে তখন শেষ দেখে ছাড়বে।

ঠিক এই সময়ে রোলো আস্তে উঠে দাঁড়াল। চোখের রোদচশমাটা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে দুটো হাত ঘষাঘষি করে নিল একটু। তারপর রতনের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে একটা চোখ সামান্য ছোট করল। ইঙ্গিতটা বুঝে নিল রতন। আর দেরি নয়। অ্যাকশন।

রতন ব্যাঙের মতো একটা লাফ দিয়ে দরজার কাছে পৌঁছেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রোলোর বাঁ

হাতের একটা ঘুষি গিয়ে পড়ল মোড়লের চোয়ালে।

এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেল যে, প্রতিপক্ষ কিছু ঠাহর করার সময় পেল না। কিন্তু তারাও পেশাদার বখাটে। বিপদ-আপদ তাদেরও নিত্যসঙ্গী। ঘুষি খেয়ে মোড়ল লোকটা ছিটকে পড়লেও দানবটা তড়িৎগতিতে পিছু হটে গেল। তারপর আচমকা লম্বা একটা ঠ্যাং বাড়িয়ে রোলোর পেটে দুর্দান্ত একটা লাথি ঝাড়ল সে। লাথিটা পুরোপুরি এড়াতে পারেনি রোলো। 'কোঁক' শব্দ করে সে উবু হয়ে বসে পড়ল মেঝেয়। দানবটা এক থাবায় জনকে ধরে দাঁড় করাল। তারপর ডান হাতে এত জোরে একটা ক্যারাটে চপ মারল যে, জনের কাঁধের হাঁড় হাতে ভেঙে যাওয়ার কথা। সেই মার খেয়ে জন চোখ উল্টে পড়ে গেল বিছানার ওপর। দানবটা এবার ঘুরে দাঁড়াল রতনের দিকে।

এতক্ষণ দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া রতন আর কিছুই করেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তাছাড়া এই দানবের সঙ্গে লড়ার জন্য অনেক ক্ষমতা থাকা দরকার। এ শুধু প্রচণ্ড শক্তিমানই নয়, ভাল ক্যারাটে জানে। নিশ্চিত একজন ব্ল্যাক বেল্ট।

দানবটার চোখে চোখ রেখে রতন লোকটাকে মেপে নিচ্ছিল। অন্তত ছ' ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। মেদহীন পেটানো শরীর। অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং বিপজ্জনক।

রতনের অবশ্য তাতে ভয় নেই। সে অনেক লড়াই করেছে। তার ওপর বাবার জন্য উদ্বেগে সে এখন মরিয়া।

দানবটাও তাকে মেপে নিল একটু। তারপর লম্বা ডান হাতটা বাড়িয়ে তার গলাটা চেপে ধরার চেষ্টা করল। রতন প্রস্তুত ছিল। চট করে সরে গেল বাঁ দিকে। তারপর শরীরের ভারসাম্য রেখে বাঁ হাতে একটা বিষ মেশানো পাঞ্চ চালাল দানবের মুখে। ঘুষিটা

সোজা গিয়ে চোয়ালে বোমার মতো ফাটল।

অন্য কেউ হলে এক ঘুষিতেই জমি ধরে নিত। কিন্তু দানবটা যেন কংক্রিটে তৈরি। একটু টলল বটে, কিন্তু নড়ল না। ফিরে লম্বা বাঁ হাতে সেও একটা কামানের গোলার মতো ঘুষি চালাল রতনের মাথায়।

মাথাটা নামিয়ে নেয় রতন। তারপর নিচু হয়েই পর পর তিনটে ঘুষি পিস্টনের মতো চালিয়ে দেয় লোকটার মাথায়, নাকে আর থুতনিতে। তিনটেই মারাত্মক ঘুষি। গড়পড়তা যে-কোনো ভাল মুষ্টিযোদ্ধারও সহ্য করার কথা নয়। কিন্তু দানবটা তিনটে ঘুষিই হজম করল।

রতন বুঝল, দানবটা ক্যারাটে জানলেও বক্সিং খুব ভাল জানে না। জানলে এই তিনটে ঘুষি খেত না বোকার মতো। তবে ঘুষি খেয়েও লোকটা দমেনি। একটু সতর্ক হয়েছে মাত্র। আগের মতো এগিয়ে এল না। দুটো মুগুরের মতো হাত মুঠো পাকিয়ে রতনের দিকে চোখ রেখে ঘুরতে লাগল।

রতন বুঝল, লোকটা সতর্ক হয়েছে। সুযোগ খুঁজছে। সেই সুযোগ ওকে দেওয়াটা বোকামি হবে। লোকটার একটা ঘুষিও যদি ঠিকমতো লাগে, তবে রতন সম্ভবত দু পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

রতন আস্তে করে এগিয়ে যায়। আত্মরক্ষার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হল আক্রমণ। প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত নাজেহাল করে না তুললে লড়াই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শুধু ভয়, এই লোকটা তো বক্সিংয়ের নিয়ম মেনে লড়বে না। দরকার হলে ক্যারাটের সাহায্য নেবে, পা চালাবে। তবু রতন সাপের মতো এগিয়ে গেল। পিছু হটতে গিয়ে দানবটা তার সঙ্গীর অচেতন দেহে পা ঠেকে টাল খেল। আর সেই মুহূর্তে রতন দু দুটো নক-আউট

পাঞ্চ করল লোকটার বাঁ চোখে আর ডান কানের একটু ওপরে।

দানবটা পড়ে গিয়েই স্প্রিং-এর পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল। তারপরই বিদ্যুৎ-বেগে ডান পা তুলে চালিয়ে দিল রতনের পেটে।

কিন্তু রতন তৈরিই ছিল। রোলোকে লাথি খেতে সে দেখেছে। কুঁজো হয়ে সে পেট সরিয়ে নিল। কিন্তু দু হাতে শক্ত ক্যাচ লোফার মতো চেপে ধরল দানবটার পায়ের গোড়ালি। জুডো খানিকটা সেও জানে। গোড়ালিটা চেপে ধরেই সে শরীর বাঁকিয়ে ঘুরে গেল উল্টো দিকে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে দানবটাকে খানিকটা শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলল মেঝেয়। স্তম্ভিত দানবটা তখনো চেতনা হারায়নি। পড়ে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে মাত্র। রতন বক্সিংয়ের নিয়ম ভেঙে নিচু হয়ে দানবটার মুখে পরপর দুটো ঘুষি মারল। ভারতের জাতীয় চ্যামপিয়নের এতগুলো একতরফা ঘুষি স্বয়ং মহম্মদ আলিকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দিত না নিশ্চয়ই। দানবটা তো মহম্মদ আলির একশো ভাগের এক ভাগও নয়। শেষ দুটো ঘুষিতে তার চেতনা লুপ্ত হল। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রইল মেঝেয়। শান্ত, ঘুমন্ত।

"শাবাশ !"

রতন একটু চমকে চেয়ে দেখে, জন উঠে বসে চেয়ে আছে তার দিকে। মুখে মৃদু হাসি। চোখে চোখ পড়তেই বলল, "শাবাশ !"

রোলোও আস্তে আস্তে দাঁড়িয়েছে। বোঝা গেল তার আঘাত গুরুতর নয়। কিন্তু জন ! দানবটার ক্যারাটে চপ ওর কলারবোন ভেঙে দেয়নি তো ?

জন মাথা নেড়ে বলল, "ভাঙেনি। তবে চোট মারাত্মক। আমি বাঁ হাত নাড়তে পারছি না। ঘাড়টাও স্টিফ লাগছে।"

"তাহলে ?" রতন অসহায় ভাবে প্রশ্ন করে।

জন মৃদু ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলে, "কিন্তু আমি অনেক মার খেয়েও শেষ পর্যন্ত যা করার তা ঠিকই করি। চলো, এখনো আসল কাজ বাকি। দরজার বাইরে বোধহয় একজন লোক পাহারা দিচ্ছে। তার ভার রোলোর ওপর ছেড়ে দাও। রোলো, তুমি আগে দরজা খুলে বেরোও।"

রোলো চকিত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল। তারপর বাইরে থেকে একটিমাত্র ঘুষির শব্দ পাওয়া গেল। তারপর একটি পতনশীল দেহের পাটাতনে আছড়ে পড়ার শব্দ।

জন ততক্ষণে মোড়ল আর দানবকে সার্চ করে একটা রিভলভার পেয়ে গেছে। সেটা পকেটে পুরে বলল, "চলো। এই জাহাজের প্ল্যান আমার মুখস্থ। ইন ফ্যাক্ট গ্রীসের যে ডকে এই জাহাজ তৈরি হচ্ছিল, আমি সেই ডক-এ কাজ করতাম। ফেবুলাস আমার চোখের সামনে জন্মায়।"

"তুমি ডকে কাজ করতে?"

"আমি সব রকম কাজ করেছি; বেঁচে থাকতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে যত রকম কাজ সম্ভব, সবই করেছি। চলো রতন। আর সময় নেই।"

"চলো।" রতন দাঁতে দাঁত চেপে বলে।



গভীর ঘুম থেকে যখন আস্তে-আস্তে চোখ মেললেন বাঞ্ছারাম, তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি হল তাঁর। তাঁর সমস্ত চেতনা

জাগ্রত। তাঁর বিস্মৃতি আর নেই। সব কিছুই তাঁর আশ্চর্য স্পষ্টভাবে মনে পড়ছে। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। তাপ বিবর্ধক যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এমন কী এই কেবিনঘরটার কথাও তাঁর মনে পড়ল। এও বুঝতে পারলেন, কয়েকজন শয়তান লোক তাঁকে এখানে ধরে এনেছে।

বাঞ্ছারাম চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন। তারপর আবার চোখ মেললেন।

ডাক্তার এগিয়ে এল। "হ্যালো, তুমি ভাল আছ ?"

বাঞ্ছারাম চোখ মিটমিট করে বললেন, "আমি রসগোল্লা খাব।"

ডাক্তার হতাশার ভাব করে আপনমনে বলল, "আবার যে কে সেই। ঠিক আছে বুড়ো, আবার ট্রুথ ইনজেকশনই তোমাকে নিতে হবে।"

বাঞ্ছারাম সবই বুঝতে পারছেন। যে-কোনো কারণেই হোক তাঁর পাগলামি সেরে গেছে, স্মৃতি ফিরে এসেছে। সে হয়তো মারধর খেয়ে, কিংবা এদের উল্টোপাল্টা ওষুধপত্রের ফলে। কিন্তু তা এরা জানে না। তাঁরও ধরা দেওয়া উচিত হবে না। বাঞ্ছারাম চোখ বুজে পড়ে রইলেন।

একটু বাদেই সেই বেঁটে লোকটা এল। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, "রুগি কেমন ?"

"একই রকম।"

"আমরা মাইক্রোফিল্মটা পেয়ে গেছি। এখন সেটা ডিসাইফার করতে হবে। ওকে আর একটু ট্রুথ ইনজেকশন দাও। তারপর আমরা ওকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাব।"

ডাক্তার সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে এল। বাঞ্ছারাম জানেন এই ইনজেকশন মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে নষ্ট করে দেয়, চিন্তাশক্তিকে

দুর্বল করে। কিছু বানিয়ে বলার ক্ষমতা থাকে না মানুষের। এই ইনজেকশন শরীরে ঢুকলে তিনি আর কিছুই করতে পারবেন না। তবু উপায় নেই। হাত পা শক্ত করে বাঁধা। বাঞ্ছারাম চোখ বুজে প্রাণপণে নিজের মনটাকে শক্ত রাখার চেষ্টা করলেন। ডাক্তার সমস্তটুকু ওষুধ ছুঁচের মুখে ঠেলে দিল তাঁর শরীরে।

একটা হুইল চেয়ারে যখন ল্যাবরেটরিতে আনা হল বাঞ্ছারামকে, তখন তাঁর চোখ বিস্ফারিত। মুখ লাল। একটু হাঁফাচ্ছেনও।

বেঁটে লোকটা এগিয়ে এল তাঁর কাছে। তারপর আচমকা কষে একটা চড় মারল তাঁর গালে। তারপর প্রশ্ন করল, "আসল মাইক্রোফিল্মটা কোথায় বুড়ো ভাম?"

চড়টা টের পাননি বাঞ্ছারাম ওষুধের গুণে। কিন্তু প্রশ্নটা তাঁর মস্তিষ্কে গিয়ে ক্রিয়া করল। তিনি শান্তস্বরে বললেন, "ক্যাকটাস গাছের তলায়।"

"ক্যাকটাস গাছের তলায় যা পাওয়া গেছে, তা দেখবে? দ্যাখো।" বলে বেঁটে লোকটা একটা প্রজেকটারের সুইচ টিপল। সামনে একটা পর্দায় ফুটে উঠল আবছা একটা ছবি। হিজিবিজি মাত্র। বেঁটে লোকটা তার নিষ্ঠুর ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এটা মাইক্রোফিল্মও নয়। একটা নষ্ট নেগেটিভের কাটা অংশ। এখন কী জবাবদিহি করবে?"

বাঞ্ছারাম দৃঢ় শান্তস্বরে বললেন, "মাইক্রোফিল্ম আছে ক্যাকটাসের তলায়।"

"নেই! নেই!" বলে চেঁচিয়ে ওঠে বেঁটে লোকটা। এই প্রথম উত্তেজিত, হতাশ এবং ক্রুদ্ধ দেখায় তাকে। বাঞ্ছারামের দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে সে বলে, "সত্যি কথা বলো! নইলে খুন করে জলে ফেলে দেব।"

ডাক্তার এগিয়ে এসে বেঁটে লোকটার কাঁধে হাত রেখে বলে, "ডগলাস, এরকম কোরো না। ও যা বলছে সত্যি কথাই বলছে। ট্রুথ ইনজেকশনের পর কোনো মানুষের পক্ষেই বানিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়।"

ডগলাস পাগলাটে চোখে ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলে, "তাহলে কোথায় গেল মাইক্রোফিল্ম ?"

এই প্রশ্নের জবাব এল সম্পূর্ণ অন্য অচেনা এক কণ্ঠ থেকে। "মাইক্রোফিল্ম আমার কাছে আছে।"

ডগলাস চমকে উঠে তাকিয়ে দেখে, দরজার কাছে লম্বা গড়নের মজবুত ছিপছিপে চেহারার একজন ভারতীয় যুবক দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ মাঝ-সমুদ্রে, চারিদিকে নিজস্ব লোকজন, তাই ল্যাবরেটরির দরজায় পাহারা রাখা প্রয়োজন মনে করেনি ডগলাস। এখন আচমকা ভূত দেখার মতো এই ছেলেটিকে আবির্ভূত হতে দেখে সে বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা হিসেবি গলায় বলল, "তুমি কে ?"

রতন তার বাবাকে দেখিয়ে বলল, "আমি ওঁর ছেলে। ওঁকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

ডগলাস একটু ক্রূর, শুকনো হাসি হেসে বলল, "ওয়েলকাম। কিন্তু কী করে এলে সেইটেই শুনতে চাই।" এই বলে ডগলাস একটু সরে এসে একটা টেবিলের পায়ায় লাগানো বোতামে চাপ দিল। চোখের পলকে দুজন লোক এসে হাজির হল দরজায়। তাদের চেহারা বিশাল এবং মুখ খুনির মতো ভয়ংকর। ডগলাস ভ্রূ কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে বলে, "তোমাদের মতো দক্ষ লোক থাকতেও এই ছেলেটি মাঝ-সমুদ্রে নোঙর করা একটা জাহাজে এসে উঠেছে। তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর জন্য

তোমাদের জবাবদিহি পরে শুনব। আগে ছেলেটিকে সার্চ করো এবং দরজা বন্ধ করে বাইরে পাহারায় থাকো।"

সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল না। লোকদুটো শুকনো মুখে দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে।

ডগলাস স্থির দৃষ্টিতে রতনকে দেখছিল। তার বাঁ হাতে কখন যে জাদুবলে একটা ছোট্ট খেলনার মতো বাইশ বোরের রিভলভার উঠে এসেছে, তা কেউ টের পায়নি। এখন রিভলভারটা আবার কাঁধ থেকে ঝোলানো গুপ্ত হোলস্টারে রেখে ডগলাস একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলল, "তুমি চালাক চতুর। খুবই বুদ্ধিমান। কী করে তুমি জাহাজে এসে উঠলে, তা পরে জানলেও চলবে। এখন বলো মাইক্রোফিল্মটা কোথায়।"

রতন মাথা নেড়ে বলল, "সেটা এখনই বলতে পারছি না, ডগলাস। আমার বাবার মুক্তির পর বাড়ি ফিরে গেলে তবেই তা বলা যাবে।"

ডগলাস বিন্দুমাত্র চঞ্চল বা বিরক্ত হল না। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তোমার বা তোমার বাবার মুক্তির কোনো প্রশ্নই আসে না। আমার চেহারাটা দেখে ভুল কোরো না। আমার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউই কোনো লড়াই জেতেনি। তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি, মাইক্রোফিল্মের সন্ধানটা তোমার জানিয়ে দেওয়াই ভাল। নইলে আমাদের টর্চার চেম্বার আছে, ট্রুথ ইনজেকশন আছে। তোমার তো মিলিটারি ট্রেনিং নেই, একটু বাদেই আমরা তোমার মুখ থেকে সত্যি কথাটা টেনে বের করে নেব। মাঝখানে খামোখা কেন কষ্ট পাবে?"

রতন থমকে গেল। সে টর্চার বা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কথাটা ভেবে দেখেনি। ট্রুথ ইনজেকশনের কথা সে আবছা শুনেছে। আমতা-আমতা করে সে বলল, "তুমি আমাদের

ক্ষতি করতে চাও কেন ? আমি তো বলছি মাইক্রোফিল্ম আমি দেব। শুধু আমার বৃদ্ধ বাবাকে ছেড়ে দাও। আমরা পুলিশকে কিছু জানাব না।"

ডগলাস আবার একটু হেসে বলে, "তোমাদের পুলিশকে আমার ভয় নেই। তবে আমাদের কয়েকজন প্রতিপক্ষ আছে। ভয়টা তাদের। কোনোভাবে খবরটা বাইরে যাক, তা আমরা চাই না। সুতরাং, ওহে যুবক, তুমি সাধ করে সিংহের ডেরায় ঢুকেছ। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা কোরো না। যদি ভালয়-ভালয় মাইক্রোফিল্মটা দিয়ে দাও, তাহলে কথা দিচ্ছি, তোমাদের মৃত্যু হবে যন্ত্রণাবিহীন।"

জন তাকে বলেছিল, "বিপদে পড়লে কোনো দ্বিধা কোরো না। সরাসরি আঘাত কোরো। এইসব দুর্জন মুখোমুখি কনফ্রনটেশনের কাছেই বরং কখনো-সখনো হারে।" কথাটা মনে পড়তেই মরিয়া রতন চট করে এক পা এগোল।

কিন্তু পুতুলের মতো ছোট্ট লোকটা জাদুই জানে বুঝি। চোখের পলকে তার হাতে দেখা দিল সেই মৃত্যুহিম ছোট্ট রিভলভারটা। সে বলল, "রিভলভারের তাক খুবই অনিশ্চিত। বেশির ভাগ সময়েই তা লক্ষ্যবস্তুর অনেক দূর দিয়ে চলে যায়। তাছাড়া আমার এই ছোট্ট যন্ত্রটা কমজোরিও বটে। তবু তোমাকে বলি, কোনোরকম নির্বোধ কাজ কোরো না।"

সাদা পোশাক পরা ডাক্তার এতক্ষণ নীরবে অবাক চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। হঠাৎ বাঞ্ছারাম মৃদু একটা শব্দ করতেই সে এগিয়ে গেল। রুগিকে পরীক্ষা করে সে ডগলাসের দিকে চেয়ে বলল, "ট্রুথ ইনজেকশনের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এর চেতনা ফিরবে। কী করব ডগলাস, একে ঘুম পাড়িয়ে দেব ?"



ডগলাস এক পলকের জন্যও রতনের দিক থেকে চোখ ফেরায়নি। সেইভাবে থেকেই বলল, "না। একে জাগতে দাও।" তারপর রতনকে বলল, "আমার মনে হয়, তুমি একা আসোনি। সঙ্গে আর কে আছে?"

"কেউ না।"

ডগলাস সে-কথা বিশ্বাস করল না। কোণের টেবিলে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল। একটুক্ষণ কথা বলেই আবার রতনের মুখোমুখি দশ ফুট দূরত্বে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে আরো দুজন এসেছে। তোমরা তিনজনে মিলে আমার তিনজন লোককে ঘায়েল করেছ। তোমার আর দুজন সঙ্গী কোথায়?"

রতন চুপ করে রইল।

ডগলাস বলল, "আমার লোক তাদের খুঁজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ধরা পড়বে। সুতরাং তোমার কষ্ট করে না-বললেও চলবে।"

রতন পরাজয়ের গ্লানি টের পাচ্ছিল। আসলে চালে একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই করার নেই।

সে তার বাবাকে পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছিল। হুইল চেয়ারে বসা, অসহায় বুড়ো একজন মানুষ। যার ভাল মন্দ কোনো বোধ নেই, স্মৃতিশক্তি নেই। তবু এই পাগল অসহায় লোকটাকেও এরা খুন করবেই। কিন্তু বাবার দিকে এক পা'ও এগোবার উপায় নেই। তাতে দুজনের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা হবে মাত্র।

ডাক্তার ঝুঁকে বাঞ্ছারামের নাড়ি দেখছিল। বাঞ্ছারাম নানা ধরনের শব্দ করছিলেন—"ওঃ! উঃ! ওরে বাবা! রসগোল্লা খাব।"

বোঝা গেল বাঞ্ছারামের চেতনা ফিরে এসেছে। রতন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কেন যে তার বাবা হিট অ্যামপ্লিফায়ার আবিষ্কার

করতে গিয়েছিলেন! সে শুনেছে, তার বাবাও যৌবনকালে একজন ভাল মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি যদি মুষ্টিযোদ্ধাই থেকে যেতেন, বৈজ্ঞানিক না হতেন, তবে পাগলও হতেন না, আজ এই বিপদও ঘটত না।

হঠাৎ ডগলাস বাঞ্ছারামের দিকে চেয়ে বলল, "এই ছেলেটিকে চিনতে পারো? দ্যাখো তো ভাল করে চেয়ে। এ কি তোমার ছেলে?"

বাঞ্ছারাম আস্তে মুখ ঘোরালেন। রতনের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

কিন্তু রতন বিস্ময়ে থ হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই সে বাবার চোখে যে ঘোলা-ঘোলা, অনিশ্চিত, উদাসীন চাউনি দেখে এসেছে, এই চাউনি মোটেই সেরকম নয়। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, বাবার চোখ অন্যরকম। আগের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, তাতে বুদ্ধির ঝিকিমিকি।

বাঞ্ছারাম চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "না, না। এ আমার ছেলে নয়। আমি রসগোল্লা খাব।"

ডগলাস রিভলভারটা হোলস্টারে ভরে আবার বেল টিপল। দরজা খুলে সেই দুটো লোক ঘরে ঢুকতে ডগলাস বলল, "বুড়োকে কেবিনে নিয়ে যাও। আর এই ছোকরাকে আটকে রাখো।"

লোকদুটো এগিয়ে আসছিল হুইল চেয়ারের দিকে। ডগলাস তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখছিল রতনের দিকে। ডাক্তার তার যন্ত্রপাতি গোছাচ্ছিল। ঠিক এইসময়ে অভাবনীয় একটা ঘটনা ঘটল।

আচমকা বৃদ্ধ অশক্ত পাগল বাঞ্ছারাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাত্র এক পা এগিয়ে একটু নিচু হয়ে তিনি ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলেন ডগলাসকে। সে ঘুষির বহর দেখে রতনও অবাক হয়ে গেল। চেতনা হারানোর আগে ডগলাসও

বোধহয় বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। এমন কী, ডগলাসের দুই স্যাঙাত পর্যন্ত থমকে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

বড় ভুল করল তারা। কাছেপিঠে একজন সুদক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা থাকলে এরকম চালে ভুল করতে নেই। যে দু তিন সেকেন্ড তারা পাথর হয়ে ছিল, সেই সময়ে রতন সক্রিয় হল। তার দুখানা ঘুষি দেড়মনি পাথরের মতো গিয়ে একজনের চোয়াল ভেঙে দিল। সে কুমড়ো-গড়াগড়ি হয়ে পড়ে যেতেই অন্যজন ফিরে দাঁড়িয়েছিল রতনের দিকে। তখন পিছন থেকে বাঞ্ছারাম একটা কাচের জার বিদ্যুৎ-বেগে তুলে নিয়ে তার মাথায় মারলেন।

এ পর্যন্ত বেশ হল। কিন্তু বাপ-ব্যাটা হঠাৎ দেখল, ডাক্তার লোকটা ডগলাসের রিভলভার বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, “হাত তোলো, পিছনের দিকে সরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও।”

দুজনেই হাত তোলে। কিন্তু রতনের ভিতরে ডগলাসের কথাটা টিকটিক করতে থাকে। রিভলভারের তাক নাকি অনিশ্চিত। প্রায়ই তা লক্ষ্যবস্তুর গায়ে লাগে না। কথাটা সত্যি কিনা তা রতন জানে না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তার একবার ঝুঁকি নিতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ রতন এক লাফে সামনের দিকে এগোয়। সঙ্গে-সঙ্গেই রিভলভারের “ফটাস” শব্দ হয়।

রতন বেকুবের মতো চেয়ে থাকে। সে ডাক্তারের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু ডাক্তার মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। রক্তের একটা পুকুর তৈরি হচ্ছে তার বুকের নিচে।

পিছন থেকে জন সান্ত্বনার গলায় বলে, “তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয় রতন, কিন্তু বোকামির নয়।”

জন রিভলভারটা নামিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে “বাঃ, রঙ্গমঞ্চ তো দেখছি আমাদের দখলে।”

রতন হুঁশ ফিরে পেয়ে বলে, "না, এখনো নয়। ডগলাসের লোকেরা তোমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে।"

"জানি।" জন শান্ত স্বরে বলে, "কিন্তু তারা ডগলাসের ল্যাবরেটরিতে ঢুকবার সাহস পাবে না। রোলো, ভিতরে এসে দরজাটা ভাল করে সেঁটে দাও।"

রতন উদ্বেগের গলায় বলে, "কিন্তু আমরা বেরোব কী করে ?"

"রাস্তা আছে।" বলে জন ল্যাবরেটরির একটা টেবিল সরায়। নিচে পাটাতনে একটা ম্যানহোলের ঢাকনার মতো বস্তু। জন সেটা তোলে। বলে, "এসো।"

ঘোরানো একটা লোহার সিঁড়ি বেয়ে তারা নামে। খুব নিচে নয়। মাত্র একতলা নেমে জন অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রতনের হঠাৎ খেয়াল হয়, রোলো এখনো নামেনি।

একটু বাদেই অবশ্য রোলো নেমে আসে নিঃশব্দে।

রতন জিজ্ঞেস করে, "রোলো এতক্ষণ কী করছিল জন ?"

জন মৃদু ব্যথিত স্বরে বলে, "কেন শুনতে চাও ?"

"কেন শুনব না ? কী করছিল রোলো ?"

জন মৃদু স্বরেই বলে, "যা করছিল তা ভদ্রলোকের কাজ নয়। বিপ্লবীদের অনেক সময় এরকম অপ্রীতিকর কাজ করতে হয়। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সেই কাজটুকু ও শেষ করে এল।"

"তার মানে কি মেরে ফেলল সবাইকে ?"

"বলেছিলাম তো, শুনতে চেও না। ডগলাস বেঁচে থাকলে আমাদের কোথাও পরিত্রাণ ছিল না। একজন পুতুলের মতো ছোট্ট মানুষ যে কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে, তা যারা ডগলাসকে জানে না, তারা কল্পনাও করতে পারবে না।"

অনেকখানি নিচে নামল তারা। তারপর এক জায়গায়

দেয়ালের গায়ে একটা হুইল ঘোরায় জন। ছোট্ট একটা ফোকর দেখা যায় দেয়ালে। জন উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বলে, "জাহাজে লোড থাকলে এই ফোকর থেকে জলের লেভেল মাত্র ছ'ফুট। লোড না থাকলে বিশ ফুট বা তারও বেশি। লোড আছে, সুতরাং বিপদের ভয় নেই। তোমার বাবাকে একটু সাবধানে নামিও রতন। আমাদের স্পীডবোট মাত্র দশ ফুট দূরে রয়েছে। সামান্য একটু সাঁতরাতে হবে। পারবে না ?"

"পারব।" রতন বলে।

বাইরে কুয়াশা ছিল। চারজন নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে এসে বোটে উঠল। জাহাজ থেকে কেউ লক্ষ করছিল না হয়তো। কে জানে !

রোলো বোটে উঠে ছাদ থেকে জাহাজের দড়ির মইটা খুলে ছেড়ে দিল। তারপর কেবিনের পাটাতনের তলা থেকে দুটো স্পার্ক প্লাগ বের করে ইঞ্জিনে লাগিয়ে নিল। দড়ির মইটা খুলে দেওয়াতে বোটটা ঢেউয়ে দুলে সরে এসেছিল একটু। রোলো স্পীডবোটের মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে স্টার্ট দিল। তারপর নক্ষত্রবেগে ছুটে গেল উল্টো দিকে।

মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল রতন। বিমর্ষ গলায় বলল, "সর্বনাশ হয়েছে জন।"

"কী হয়েছে ?"

"আমার মোজার মধ্যে সেই মাইক্রোফিল্মটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। খেয়াল ছিল না। জলে সেটা বোধহয় গেছে।"

জন বলল, "হায় ঈশ্বর !"

রোলোও একটা অদ্ভুত শব্দ করল সামনে থেকে।

জন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "কী আর করা যাবে ! আমার ইচ্ছে ছিল তোমার বাবাকে অ্যামেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করে

সুস্থ করে তুলব। তারপর ফিরে এসে তিনি হিট অ্যামপ্লিফায়ার নিয়ে কাজ করবেন। আমি হব তাঁর আন্তর্জাতিক এজেন্ট। তা আর হল না।"

বাঞ্ছারাম চোখ মেললেন। চারিদিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, "মাইক্রোফিল্মেরও দরকার নেই। আমার চিকিৎসারও দরকার নেই।"

বাঞ্ছারাম মৃদু হেসে বলেন, "আমি স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়েছি। হিট অ্যামপ্লিফিকেশনের ফরমুলা আজও ভুলিনি। কাজ কিছু কঠিন হবে না। নিজের ল্যাবরেটরিতে ফিরে গিয়েই কাজ শুরু করব।"

স্তম্ভিত জন বলে, "আপনি কি সুস্থ?"

"পুরোপুরি। হিট অ্যামপ্লিফায়ার নামটা এরকম অদ্ভুত কেন জানো? আমি তাপকে বাড়ানোর জন্য একটা শব্দের সাহায্য নিয়েছি। এই সাইলেন্ট সাউন্ড। মানুষ তা কানে শুনতে পায় না। মৃদু একটা কম্পন মাত্র। সবই আমার মনে আছে।"

আনন্দে জন বাঞ্ছারামকে জড়িয়ে ধরে বলে, "কিন্তু কী করে আপনি সুস্থ হলেন?"

বাঞ্ছারাম মৃদু হেসে বললেন, "বোধহয় শক থেরাপি। ওরা আমাকে প্রচণ্ড মারধর করেছিল, ট্রুথ ইনজেকশন দিয়েছিল। সেই সব শক কখন আমার মাথার ধোঁয়া কাটিয়ে দিয়েছে।" এই বলে বাঞ্ছারাম রতনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমিই রতন?"

রতন উঠে এসে স্লীপিং ব্যাগে ঢাকা বাঞ্ছারামের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কান্নায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ বাবা।"

বাঞ্ছারাম স্লীপিং ব্যাগ থেকে হাত বের করে রতনের মাথায় রাখলেন। "তুমি যে এত বড় হয়েছ তা আমি বুঝতেই পারিনি। দীর্ঘদিন আমি এক অদ্ভুত মানসিক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম। আমার

দিদি কি বেঁচে আছে ?”

“আছে বাবা।”

জন আর রোলোকে দেখিয়ে বাঞ্ছারাম জিজ্ঞেস করেন, “এরা কারা ? তোমার বন্ধু ?”

জন হাত বাড়িয়ে বাঞ্ছারামের হাত চেপে ধরে বলে, “আমরা আপনাদের বন্ধু।”

বাঞ্ছারাম একটু হাসলেন।

তাঁরা বাড়িতে পৌঁছলেন দুপুর পার হয়ে। রতনের পিসি আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। রঘু চেঁচাতে-চেঁচাতে লাফাতে লাগল। পাড়া-প্রতিবেশী ভিড় করে দেখতে এল বাঞ্ছারামকে। আসতে লাগল ঝাঁকে-ঝাঁকে রিপোর্টার, পুলিশের লোক, বাঞ্ছারামের পুরনো বন্ধু-বান্ধবরা।

অনেক রাতে অভ্যাগতরা বিদায় হল। জন আর রোলো ফিরে গেল তাদের হোটেলে। পিসি আর রতন ঘুমিয়ে পড়ল। এখন বাঞ্ছারাম তাঁর সাধের ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকলেন। ভ্রূ কুঁচকে চারদিকে চেয়ে দেখলেন একটু। সব আবার সাজিয়ে তুলতে সময় লাগবে কিন্তু তাতে কী ? তিনি এখন প্রচণ্ড উদ্যম বোধ করছেন ভিতরে ভিতরে। শত্রুপক্ষ তাঁর অনেক উপকার করেছে।

বাঞ্ছারাম তাঁর জাদু চেয়ারে বসে একটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে সেই দশ-বারো বছর আগেকার মতো হাঁক দিলেন, “রঘু ! রসগোল্লা।”

হ্যাঁ, তখনো তাঁর মিষ্টি খাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু গভীর রাতে রঘু তাঁকে রসগোল্লা সাপ্লাই করত।

হাঁক দিতে না দিতেই রঘু মস্ত টেবিলের তলা থেকে বিরক্ত মুখে বেরিয়ে এসে আলমারি খুলে দশ-বারো বছর আগেকার মতোই এক ভাঁড় রসগোল্লা বের করে দিল। তারপর বলল,

'রসগোল্লা আবার একটা খাবার ! জিনিস হল চাপড়ঘন্ট ।"

"তোকে বলেছে !" গম্ভীর স্বরে ধমকে ওঠেন বাঞ্ছারাম ।

রঘু সমান তেজে বলে, "খাচ্ছেন খান, কিন্তু ছিবড়ে ফেলবেন । আমার মেজো পিসেমশাইও রসগোল্লার ছিবড়ে ফেলতেন ।"

বাঞ্ছারাম অনেকদিন পর খুব হোঃ হোঃ করে হাসলেন ।




9 788170 668343

কিশোর কাহিনী সিরিজ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বক্সার রতন

বক্সার রতন • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



